পুরবার্তা

বৈশাখ ১৪৩০ (এপ্রিল ২০২৩)

সাহিত্য–সংস্কৃতি সংখ্যা

শিলিগুড়ি পুরনিগম

মানুষের সেবায় নিরলস

"পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড় তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পেছনে তাকিও না, শুধু সামনের দিকে তাকাও-অসীম শক্তি, অসীম উদ্যম ও অসীম সাহস এবং অসীম ধৈর্য্য — এরা একাই পারে মহান কোন কর্ম সম্পন্ন করতে

— স্বামী বিবেকানন্দ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সম্পাদিত কর্মসমূহ

১) শহরে জমে থাকা জঞ্জাল বায়ে-মাইনিং পদ্ধতিতে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ শুরু

২) বাড়ির নকশা, জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র, ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ অনলাইনে পাবার সুবিধা

৩) শহরের সতেরোটি স্থানে গভীর নলকূপ বসানোর সিদ্ধান্ত ও কাজ শুরু

৪) শহরকে উন্মুক্ত স্থানে 'শৌচকর্ম মুক্ত' এলাকা হিসেবে ঘোষণা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় খাটা পায়খানাগুলির জায়গায় শৌচাগার নির্মাণ।

৫) শহরে 'মা' ক্যান্টিন চালু

৬) মিউটেশন ফী দুই শতাংশের পরিবর্তে এক শতাংশ করা

৭) পুরনিগমের একশ শতাংশ স্থায়ী কর্মচারির স্বাস্থ্যবিমার একশ শতাংশ প্রিমিয়াম বহন করা

৮) অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি

৯) হাউজিং ফর অল প্রকল্প পুনরায় চালু

১০) পুরনিগমের মূল কার্যালয় ঢেলে সাজানো, নতুন বিল্ডিং- এর কাজে গতি আনা

১১) পুরনিগমের কোলকাতাস্থিত অতিথিনিবাস পুনর্নির্মাণ, আরেকটি নতুন ভবন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু

১২) পান্থনিবাস এবং কিরণচন্দ্র ভবনকে নতুন রূপ দান

১৩) দরিদ্রতম মানুষদের ভাতা দেওয়ার থমকে থাকা কাজ পুনরায় চালু করা

১৪) দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসনের স্বার্থে একাধিক প্রশাসনিক সংস্কার

১৫) কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটকে ঢেলে সাজানো।

১৬) ভাড়া গাড়ির পরিবর্তে নিজেরা গাড়ি কিনে জঞ্জাল অপসারণের মাধ্যমে ব্যয় সংকোচ

১৭) পুরনিগমকে কাগজহীন ই-অফিসে রূপান্তরিত করার কাজ শুরু

১৮) শহরে বিভিন্ন এলাকায় স্থাপিত মনীষীদের মূর্তিগুলি সপ্তাহে দুদিন পরিষ্কার করা

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রিয় শহর শিলিগুড়ির সার্বিক ও সুপরিকল্পিত উন্নয়নের রূপরেখা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শহরের নাগরিকবৃন্দের সহযোগিতা, সুপরামর্শ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই তার সফল রূপায়ণ সম্ভব

Design and Printed by MAM COMPUTER

পুরবার্তা

বৈশাখ ১৪৩০ (এপ্রিল ২০২৩)

সাহিত্য-সংস্কৃতি সংখ্যা

শিলিগুড়ি পুরনিগম

মানুষের সেবায় নিরলস

পুরবার্তা

বৈশাখ ১৪৩০ (এপ্রিল ২০২৩) সংখ্যা
আহ্বায়ক, সম্পাদকমণ্ডলী ■ প্রণব কুমার ভট্টাচার্য
প্রকাশক ■ শিলিগুড়ি পুরনিগম
শিলিগুড়ি পুরনিগমের আলোকচিত্র ■ মৃন্ময় নায়েক
বর্ণ সংস্থাপন ও বিন্যাস ■ মাম কম্পিউটার, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
চলভাষ ঃ ৯৮৩২০৯৬৩৬১
মুদ্রক ■ BBHS PRAKASHAN বিভাহেসু প্রকাশন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
চলভাষ ঃ ৯৮৩২৩৯৬৩৬১

শিলিগুড়ির ইউনিয়ন বোর্ড, পুরসভা, পুরনিগম এবং পৌরপ্রশাসক মণ্ডলীর প্রথম চেয়ারম্যান, মেয়র ও মুখ্য প্রশাসকবৃন্দ

শচীন্দ্রমোহন গুহ
(১৯৪৯-১৯৫২)

জগদীশ ভট্টাচার্য
(১৯৫৮-১৯৬২)

কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী
(১৯৭৪-১৯৭৯)

স্বপন সরকার
(১৯৮১-১৯৮৮)

বিকাশ ঘোষ
(১৯৯১-১৯৯৩ / ১৯৯৪-২০০৮)

গৌতম দেব
মুখ্য প্রশাসক
প্রশাসক মণ্ডলী, শিলিগুড়ি পুরনিগম
(৭-৫-২০২১-২৪-১২-২০২১)

শিলিগুড়ি পুরনিগমে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা মেয়রের দায়িত্ব পালন করেছেন

বিকাশ ঘোষ
(১৯৯৪-২০০৮)

মুন্সি নুরুল ইসলাম
(২০০৮)

গঙ্গোত্রী দত্ত
(২০০৯-২০১৪)

অশোক ভট্টাচার্য
(২০১৫-২০২০)

গৌতম দেব
(২২-০২-২০২২ থেকে এখনো পর্যন্ত)

SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION
MAYOR-IN-COUNCIL

SRI GOUTAM DEB
MAYOR
(General Administration, PW Department, Building, Planning & Development, Finance, Accounts & Other Remaining Departments)

Sri PRATUL CHAKRABORTY
CHAIRMAN

Sri RANJAN SARKAR (RANA)
DEPUTY MAYOR
(UPE, Slum Development, NULM, Urban Employment, Traffic, Minority)

Sri DULAL DUTTA
MEMBER, Mayor-in-Council
(Water Supply, Health & NUHM)

Sri RAJESH PRASAD SAH (MUNNA)
MEMBER, Mayor-in-Council
(Parking, All Guest House, Advertisement)

Sri RAM BHAJAN MAHATO
MEMBER, Mayor-in-Council
(Property Tax, Assessment, Market)

Sri MANIK DEY
MEMBER, Mayor-in-Council
(Conservancy, SWM, Bio-Mining, Vehicle)

Sri KAMAL AGARWAL
MEMBER, Mayor-in-Council
(Electric, Law, IT Cell)

Miss SHOBHA SUBBA
MEMBER, Mayor-in-Council
(Education & Culture)

Sri DILIP BARMAN
MEMBER, Mayor-in-Council
(Housing for All, Trade License, Sports)

Smt. SRABANI DUTTA
MEMBER, Mayor-in-Council
(Child & Mother Care, Mid-Day Meal, Birth & Death)

Smt. SIKTA DEY BASU RAY
MEMBER, Mayor-in-Council
(Plantation & Beautification, Environment, Parks & Gardens)

SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION

BOROUGH CHAIRPERSONS

Miss Gargi Chatterjee

Chairperson
Borough Committee No. 1

Md. Alam Khan

Chairman
Borough Committee No. 2

Smt. Mili Seal Sinha

Chairperson
Borough Committee No. 3

Mr. Jayanta Saha

Chairman
Borough Committee No. 4

Smt. Pritikana Biswas

Chairperson
Borough Committee No. 5

COUNCILLORS'
SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION

Ward No	Ward Councilor's Name	Contact Details
1	Shri Sanjay Pathak	98323-86647
2	Smt. Gargi Chatterjee	96097-11487
3	Shri Ram Bhajan Mahato	98324-64771/62955-44122
4	Shri Vivek Singh	94340-19501
5	Miss Anita Mahato	98320-46518
6	Md. Alam Khan	98320-47288
7	Shri Pintu Ghosh	82506-11681 / 98320-73642
8	Smt. Shalini Dalmia	98320-94353
9	Shri Amit Jain	98325-11088
10	Shri Kamal Agarwal	98320-21188/9474390906
11	Smt Manjushree Paul	98326-99716
12	Shri Basudeb Ghosh	86173-45441 / 94340-12185
13	Shri Manik Dey	94342-22002 / 97347-45958
14	Smt. Srabani Dutta	98323-59118
15	Shri Ranjan Sarkar (Rana)	98323-56560
16	Shri Sujay Ghatak (Kala)	94340-67570
17	Smt. Mili Seal Sinha	94344-27285 / 89184-36307
18	Shri Sanjay Sharma	98320-63605
19	Smt. Mousami Hazra	98320-15931
20	Smt. Abhaya Bose	98320-98157
21	Shri Kuntal Roy	98320-11484 / 70011-77165
22	Shri Dipta Karmakar	96411-31706
23	Smt. Lakshmi Paul	90023-81488
24	Shri Pratul Chakraborty	70011-06839
25	Shri Jayanta Saha	94340-06923
26	Smt. Sikta Dey Basu Ray	70638-60170
27	Shri Prasanta Chakraborty	78660-27884
28	Miss Samprita Das	98325-98244

COUNCILLORS'
SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION

Ward No	Ward Councilor's Name	Contact Details
29	Shri Saradindu Chakraborty (Joy)	94343-84981
30	Smt. Sathi Das	81674-43301
31	Miss Moumita Mondal (Mou)	90642-69168
32	Shri Tapas Chatterjee	98324-39929
33	Shri Goutam Deb	75480-33333
34	Shri Biman Chandra Tapadar	94740-28029
35	Smt. Sampa Nandi	97490-61806
36	Shri Ranjan Sil Sharma	98320-66979
37	Shri Alok Bhakta	97759-51511
38	Shri Dulal Dutta	98324-62652
39	Smt. Pinki Saha	79082-33844 / 98324-66194
40	Shri Rajesh Prasad Sha (Munna)	98324-27208
41	Smt. Shivika Mittal	98301-34446
42	Miss Shobha Subba	86373-52617
43	Shri Sukh Deo Mahato	79083-34852
44	Smt. Pritikana Biswas	89184-52321/98325-95506
45	Shri Munshi Nurul Islam	98327-56882 / 94340-85444
46	Shri Dilip Barman	90641-57921
47	Shri Amar Ananda Das	97333-84284 / 9832362717

OFFICIALS

Sri SONAM WANGDI BHUTIA

COMMISSIONER

Sri SUBHANKAR ROY
WBCS(Exe)

SECRETARY

Sri GOPINATH BASAK
WBA & AS

FINANCE OFFICER

পুরবার্তা

বৈশাখ ১৪৩০ (এপ্রিল ২০২৩)

উপদেষ্টা মন্ডলী ঃ

১) ডাঃ শেখর চক্রবর্তী

২) শ্রী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

৩) শ্রী পার্থ চৌধুরী

৪) অধ্যাপক সঞ্জীবন দত্ত রায়

৫) শ্রী সুদীপ্ত রায় (তাপু)

সম্পাদক মন্ডলী ঃ

১) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য (আহ্বায়ক)

২) শুভময় সরকার

৩) সুদীপ চৌধুরী

৪) বিপুল দাস

৫) শেষাদ্রি বসু

৬) পলক চক্রবর্তী

৯) সেবন্তী ঘোষ

১০) জিনিয়া মিত্র

১১) সুপ্রকাশ রায়

১২) প্রবীর চক্রবর্তী

১৩) অভয়া বসু

১৪) শান্তনু দাস

১৫) শুভঙ্কর রায়, সচিব, শিলিগুড়ি পুরনিগম

স|ম্পা|দ|কী|য়

আবেগের প্রদীপে উৎসাহের স্ফুলিঙ্গ সংযোগেই প্রজ্বলিত হয় সৃজনের দীপশিখা। কোনো প্রতিষ্ঠান, সাধারণভাবে যাঁরা সৃজনকর্মের সঙ্গে সেভাবে যুক্ত নন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই আবেগের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। শিলিগুড়ি পুরনিগমের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকমণ্ডলী যখন 'পুরবার্তা' নবরূপে প্রকাশের ব্যাপারে অতিমাত্রায় উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তখন কিছুটা সংশয় যে জাগেনি এমন নয়। কিন্তু প্রশাসকমণ্ডলী থেকে নির্বাচিত পুরবোর্ডে উত্তীর্ণ হবার পর থেকে 'পুরবার্তা' নিয়মিত প্রকাশের বিষয়ে মাননীয় মহানাগরিক শ্রী গৌতম দেব মহাশয়ের নিরন্তর প্রণোদনা সেই সংশয় অপনোদন করেছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা প্রকাশের সময় থেকেই পরিকল্পনা ছিল বছরে দু'টি করে নিয়মিত সংখ্যা প্রকাশের। সেই পরিকল্পনা রূপায়িত হতে যে বিলম্ব হল তার কারণ আমাদের ব্যস্ততা এবং প্রকাশিত যে হতে পারল তার কারণ পুরনিগম তথা মাননীয় মহানাগরিকের আন্তরিক সদিচ্ছা। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরকম কাজ করার আরও একটি অসুবিধে হতে পারে এই যে, কোন না কোন দিক থেকে কিছু বাধ্যবাধকতার সম্ভাবনা। পুরনিগমের বর্তমান পুরবোর্ড সেদিক থেকে 'পুরবার্তা'র সম্পাদকমণ্ডলীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেজন্য তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

' পুরবার্তা' এখন থেকে বছরে দু'বার বৈশাখ এবং আশ্বিন সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। নিয়মিত প্রকাশনার দিকে লক্ষ্য রেখে স্থির করা হয়েছে, প্রতিটি সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক হবে, যেমন এবারের বৈশাখ সংখ্যা শিলিগুড়ির সাহিত্য-সংস্কৃতি সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত। প্রতি সংখ্যায় নিয়মিত কিছু বিভাগ শুরু করা হচ্ছে। যেমন, শিলিগুড়ির সৃজনকর্মীদের সাহিত্য সৃজনের কিছু কিছু পরিচয় প্রত্যেক সংখ্যায় তুলে ধরা হবে। যেহেতু শহর শিলিগুড়ি ভাষিক বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল, সেহেতু বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য কর্মই এখানে স্থান পাবে। 'পুনরুচ্চারণ' বিভাগে শিলিগুড়ির প্রয়াত লেখকদের লেখা পুনর্মুদ্রিত হবে। শহরকে যাঁরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে পরিচিতি দিয়েছেন তাঁদের স্মরণ করা হবে 'স্মরণীয় যাঁরা' বিভাগে। পুরনিগমের ধারাবাহিক উন্নয়নকর্মের পরিচয় প্রতি সংখ্যায় প্রতিফলিত হবে। এছাড়া ' শেষ পাতা'য় থাকবে পুরনো শিলিগুড়ি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। আপাতত এইভাবে ভাবা হয়েছে। নিয়মিত বিভাগের ক্ষেত্রে আরও কিছু সংযোজনের প্রস্তাব এলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করা যাবে।

এই সংখ্যায় শিলিগুড়ি শহরের সাম্প্রতিক সাহিত্য, নাট্য, নৃত্য, আবৃত্তি, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। 'পুনরুচ্চারণ' বিভাগে চোমং লামা'র একটি গল্প পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

শহরের সৃজনকর্মের পরিচয় প্রসঙ্গে বাংলা ছাড়াও হিন্দি, নেপালি, রাজবংশী ও পাঞ্জাবী ভাষার সাহিত্যকর্মের সামান্য নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে।

'স্মরণীয় যাঁরা' বিভাগে শিলিগুড়ির নাট্যসংস্কৃতিকে যিনি সাবালক করেছেন, সেই অমল চক্রবর্তীকে যেমন স্মরণ করা হয়েছে, তেমনি শহর শিলিগুড়ির সর্বজনপ্রিয় কবি-অধ্যাপক সমর চক্রবর্তীকেও এই সংখ্যায় শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। ক্রীড়া জগৎ থেকে চিত্ত চন্দের স্মৃতিচারণা করা হয়েছে। এই বিভাগে আরও অন্তত দুটি লেখা প্রকাশের ভাবনা ছিল কিন্তু যথাসময়ে লেখা এসে না পৌঁছনোয় পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য হলাম।

কোনো কাজেই ত্রুটিহীনতার দাবি করা হাস্যকর। আমরা সে দাবি করছি না। প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য পেয়ে আমরা একটা কাজ নিয়মিত করবার চেষ্টা করছি মাত্র। সম্পাদকমণ্ডলীর প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তা সত্ত্বেও যাঁর যতটা সম্ভব সহায়তা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরকম কর্ম সাধিত হয় কয়েকজনের আন্তরিক এবং নিরলস প্রয়াসে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা আশা করব, শহর শিলিগুড়ির মানুষ নিজেদের সুচিন্তিত পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এই প্রয়াসকে দীর্ঘজীবী করতে এবং উত্তরোত্তর এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সহায়ক হবেন। সকলকে শুভ বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইতি টানছি।

সূচিপত্র

১) তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি	—	শ্রী গৌতম দেব	১
২) নতুন দিনের নতুন আলো	—	শ্রী প্রতুল চক্রবর্তী	২
৩) উপ-মহানাগরিকের উচ্চারণে	—	শ্রী রঞ্জন সরকার	৩
৪) শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে	—	শ্রীমতী শোভা সুব্বা	৪
৫) স্মরণীয় যাঁরা			
ক) অমল চক্রবর্তী স্বয়ং একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান	—	গৌতম চক্রবর্তী	৭
খ) জীবনরসিক সমর চক্রবর্তী ... সকলজনপ্রিয় সমরদা...	—	প্রণব কুমার ভট্টাচার্য	১৮
গ) খেলার ছলে খেলার শুরু	—	অমিত খাসনবিশ	২২
৬) সাম্প্রতিক শিলিগুড়ির সংস্কৃতিচর্চার নানা দিগন্ত			
ক) শিলিগুড়ির সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চা	—	কৌশিক জোয়ারদার	২৭
খ) সাম্প্রতিক সময়ে শিলিগুড়ির থিয়েটার	—	পার্থপ্রতিম মিত্র	৩২
গ) সাম্প্রতিক সময়ে শিলিগুড়ির নৃত্যচর্চা	—	সঙ্গীতা চাকী, সহেলী বসু এবং অদিতি দাস	৩৮
ঘ) 'কণ্ঠশিল্প আবৃত্তি' এবং আমার শহর শিলিগুড়ি	—	অমিতাভ ঘোষ	৪০
ঙ) ভাস্কর্যের শিলিগুড়িতে আশার আলো	—	মৈনাক ভট্টাচার্য	৪২
চ) শিলিগুড়ির চিত্রশিল্প চর্চা প্রসঙ্গে দু'চার কথা	—	সুদীপ্ত রায়	৪৫
ছ) দার্জিলিং জেলার রাজবংশী ভাষায় সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চা	—	বিশ্বজিৎ রায়	৪৭
৭) পুনরুচ্চারণ			
ফেরাই	—	চোমং লামা	৫৭
পুরনো সে দিনের কথা	—	বিমলেন্দু দাম	৬৩
৮) সাম্প্রতিক শিলিগুড়ির সৃজন-বৈচিত্র			
বাংলা			
ক) তুমি আছো	—	পঙ্কজ ঘোষ	৭৭
খ) ম্যানিকুইনের শহর	—	অনিমেষ	৭৭
গ) কাঠেরা বৃক্ষ জন্মান্তর	—	স্বাগতা ঘোষ	৭৮
ঘ) মুখের ভাষা খারাপ	—	সৌরভ মজুমদার	৭৮
ঙ) আলোর উৎসধারা	—	শুভ্রদীপ রায়	৭৯
চ) একটি অতিপ্রাকৃত গল্প	—	শুভময় সরকার	৮০
ছ) পরশ	—	সুদীপ চৌধুরী	৮৬
জ) তেজ	—	প্রণব কুমার ভট্টাচার্য	৯০

সূচীপত্র

হিন্দি

ক) सुख तक पहुंचने की राह — भीखी प्रसाद ৯৬

খ) मैं आवाज हूँ — प्रतिमा जोशी ৯৭

নেপালি

क) यस्तै छ है हाम्रो सिलिगुड़ी — कृष्ण प्रधान ৯৮

ख) सिपाही हूँ — नीता तामाङ ১০২

ग) हर्कधोजको ब्यथा....... — मणिकुमार शर्मा ১০৩

রাজবংশী

ক) ভাষা — নিখিলেশ রায় ১০৫

খ) চৈতমাস — পাঞ্চালী সিনহা ১০৬

গ) হামার দুখ — নৃপেন বর্মণ ১০৬

ঘ) ভোজভাত — নন্দ গোপাল রায় ১০৭

পাঞ্জাবী

ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੀ ਚਾਹ — ইন্দারজিত কাউর ১০৯

৯) শিলিগুড়ি পুরনিগমের উন্নয়নের খতিয়ান ১১০

১০) শেষের পাতা

পুরনো শিলিগুড়ি, স্মৃতি আর বৃষ্টির কথামালা। — সুদীপ্তা সরকার ১২৯

‘তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি’

শ্রী গৌতম দেব
মহানাগরিক, শিলিগুড়ি

সর্বপ্রথমে সকল শিলিগুড়িবাসীকে জানাই শুভ বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই নতুন বছর সকলের শুভ হোক এই প্রার্থনা করি।

আমাদের বর্তমান পুরবোর্ড সবেমাত্র এক বছর পূর্ণ করেছে। এই অল্প সময়ে বর্তমান বোর্ড তার সাধ্যমতো সচেষ্ট হয়েছে এই শহরের সার্বিক নাগরিক পরিষেবা ও স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করতে। সেই লক্ষে স্থির থেকে আমরা এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে । আমরা বিগত এই এক বছরে কী কী কাজ করেছি তার একটি মূল্যায়ন পুস্তিকা প্রকাশ করেছি । শিলিগুড়ির আপামর জনসাধারণের অসুবিধা-অভিযোগ ও পরামর্শ সরাসরি শুনবার জন্য ‘টক টু মেয়র’ চালু করেছি। প্রতি শনিবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকে। টেলিফোন নাম্বার হল ১৮০০৩৪৫৩৩৫০ / ১৮০০৮৮৯৩১৫২। এই নাম্বার দুটিতে মেয়রের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারেন। সেই মতো তাঁদের বেশিরভাগ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দ্রুততার সঙ্গে করতে পেরেছি। একটি সমীক্ষায় আমরা দেখেছি ৮৫ শতাংশ নাগরিক এই পরিষেবায় খুশি ।

‘পুরবার্তা’ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এটি একটি পৌর প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বার্তা-পুস্তিকা যার মাধ্যমে পৌর নিগমের দ্বারা সংঘটিত বহুবিধ কর্মধারার ওপর আলোকপাত করা হয়। এতে পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া, শহরের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। পাশাপাশি শহরের উন্নয়নের গতি ও রূপরেখা সম্পর্কে নাগরিকদের একটি ধারণা তৈরি হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ২০২১ সালে প্রশাসক মন্ডলীর সময়কালে আমরা একটি পুরবার্তা প্রকাশ করেছিলাম ‘স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা’ হিসেবে। এ বছর ‘পুরবার্তা ২০২৩’ আমাদের বর্তমান বোর্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা।

আমি পুরবার্তা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকল সৃজনশীল গুণীজনদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় এই সকল কাজকর্মগুলো হয়ে থাকে ।

সবশেষে বলি —

আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে ।

প্রতুল চক্রবর্তী
Pratul Chakraborty

সভাপতি
শিলিগুড়ি পৌর নিগম
Chairman
Siliguri Municipal Corporation

No. ____________ Date ____________

"নতুন দিনের নতুন আলো,
দূরে নিয়ে যাক নিকষ কালো;
জাগুক তোমার আলোর স্পর্শে,
জেগে উঠুক মন নতুন বর্ষে।"

— শুভ নববর্ষ।

সকল নাগরিক বৃন্দকে এবং আমাদের পৌরনিগম ও পৌরনিগমের সকল কর্মীবৃন্দের জানাই শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আমাদের পৌরনিগমে দায়িত্ব গ্রহণের একবছর কিছুদিন আগেই আমরা পূর্ণ করেছি। এই কটি একবছরে আমরা শিলিগুড়ি পৌরনিগমের অন্তর্গত সকল নাগরিকবৃন্দকে যথাযথ পরিষেবা প্রদান করার চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতে সেইমতন চেষ্টা চালিয়ে যাব।

পৌরনিগম এবং পৌরকর্মীদের আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল যাতে তারা ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে, সম্মিলিত ভাবে সকলের জন্য কাজ করে যেতে পারে। আমি সর্বদা সর্বাঙ্গীন ভাবে তাদের পাশে আছি এবং থাকব। আগামী দিনে শিলিগুড়ি পৌরনিগম যাতে আমাদের হাত ধরে আরো সুদীর্ঘ পথ সুন্দরভাবে চলতে পারে এই কামনা করি।

"ইচ্ছেগুলো পূর্ণ হোক
সুখের দোলায় দুলে
স্মৃতি হয়ে সঙ্গী হোক
সর্বদা হাসো প্রাণ খুলে।"

প্রতুল চক্রবর্তী
Chairman
Siliguri Municipal Corporation

বাঘাযতীন রোড, পোঃ শিলিগুড়ি, জেলাঃ দার্জিলিং - ৭৩৪০০১, ফোনঃ ৭০০১১ ০৬৮৩৯, ৯৪৩৪৩ ৭৬২৪৭, ই মেলঃ pcsiliguri@gmail.com
Baghajatin Road, P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling - 734 001, Phone : +91 70011 06839, +91 94343 76247, Email: pcsiliguri@gmail.com

উপ-মহানাগরিকের উচ্চারণে

শ্রী রঞ্জন সরকার
উপ-মহানাগরিক

প্রথমেই জানাই শিলিগুড়ির নগরবাসীদের বাংলা নববর্ষ ১৪৩০-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলা নববর্ষ সকলের শুভ হোক এই প্রার্থনা করি।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিলিগুড়ি পৌর নিগমের মুখপত্র হিসেবে 'পুরবার্তা'র একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বিগত সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে এই পুরবার্তা প্রকাশিত হলেও আমরা এই পুরনিগম বোর্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করবার পর প্রচেষ্টা করেছি নিয়মিতভাবে পুরবার্তা প্রকাশ করবার জন্য। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২, আমাদের নব গঠিত বর্তমান পুর বোর্ড মাত্র এক বছর সময়কাল অতিক্রম করল। এই অল্প সময়ে আমরা ''নব পর্যায় স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা- ২০২১'' শীর্ষক পুরবার্তা প্রকাশ করেছিলাম খুব অল্প সময়ে।

এবারে পুরবার্তা সংখ্যায় থাকছে বর্তমান বোর্ডের সময়ে বিভিন্ন কাজ-কর্মের মুখ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত সহ সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ভিত্তিক লেখা। সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য সৃজনশীল কাজ-কর্মের প্রসারে পৌর নিগম সর্বদা সচেষ্ট এবং এই পুরবার্তায় তার প্রতিফলনও ঘটেছে।

আমাদের এই পুরবার্তার পাঠ প্রতিক্রিয়ায় আমরা গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রস্তাব কামনা করছি।

পরিশেষে এই পুরবার্তা প্রকাশের জন্য যে সকল সৃজন শিল্পীরা এবং শিলিগুড়ির সুধী নাগরিবকৃন্দ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে

শ্রীমতী শোভা সুব্বা
মেয়র পারিষদ
শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তর

সর্ব প্রথমে শিলিগুড়ির নাগরিকবৃন্দ তথা পুরবার্তার পাঠকবৃন্দকে জানাই শুভ বাংলা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিগত বছরের মতো এবছরও আমরা পুরবার্তা প্রকাশ করতে চলেছি। আমাদের বর্তমান পুর বোর্ডের মেয়াদ মাত্র ১ বছর ২ মাস হল। এই অল্প সময়ে ইতিমধ্যেই আমরা পুরবার্তার একটি সংখ্যা 'নব পর্যায়, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা- ২০২১' প্রকাশ করেছি।

এবারের পুরবার্তায় বিগত এক বছরের এই স্বল্প সময়ে আমাদের পৌর নিগমের বিভিন্ন দপ্তরে যে সকল কাজগুলো করা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ-কর্মের কথা উল্লেখপূর্বক শিল্প-সংস্কৃতি- সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক লেখাও স্থান পেয়েছে। সুধী পাঠকদের সুচিন্তিত মতামত ও প্রস্তাবে আগামী সংখ্যা আরও সমৃদ্ধ হবে - এই আশা রাখি।

পরিশেষে এই পুরবার্তা প্রকাশে পুরবার্তা কমিটির সকল সদস্য, আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীবৃন্দ, লেখক-কবি এবং সংশ্লিষ্ট ছাপাখানার কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই পুরবার্তা প্রকাশ করা যেত না।

স্মরণীয় যাঁরা

শিলিগুড়ি শহরের পরিচিতি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, এরকম প্রয়াত ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হবে নিয়মিত এই বিভাগে।

অমল চক্রবর্তী স্বয়ং একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান

■ গৌতম চক্রবর্তী

এই শহর শিলিগুড়িসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন শুরু হয়ে গেছে কথাসাহিত্যিককে নিয়ে নানান আলোচনা, স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ, কবিতা-গানের আয়োজন, ছবি আঁকার উদ্দীপনা একই সাথে শরৎবাবুর লেখা নানান গল্প-উপন্যাসের নাট্যভাষ নির্মাণ ক'রে তাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস। ঠিক এমন সময়েই এই শহরের প্রাচীনতম সংস্থা মিত্র সম্মিলনী আয়োজন করেছিল শরৎ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সাত সন্ধ্যার একটি নাট্যউৎসব। যেখানে কর্ণিক, দামামাসহ হাজির ছিল মিত্র সম্মিলনী, আর্য্য-সমিতি, মিলেমিশে, কল্লোল। অভিনীত হয়েছিল ছ'টি নাট্যদলের সাতটি নাটক। আর এই নাট্য প্রযোজনার মধ্যে দুটো শরৎ কাহিনীর নাট্যরূপকার ছিলেন অমল চক্রবর্তী। একটি 'মামলার ফল'। অন্যটি 'পথের দাবী'। অমল দুটো নাটকেরই নির্দেশক ছিলেন। জানা যায় যে, সেই সময় থেকেই তিনি শিলিগুড়ির নাট্যদল 'দামামা' সহ অন্যান্য নাটকের দলগুলোর প্রতি ধীরে ধীরে যত্নবান হয়ে উঠতে সচেষ্ট ছিলেন।

'প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ' !

'পথের দাবী' নাটকটি দেখতে গিয়ে এমনই একটি বিজ্ঞপ্তি দেখা গিয়েছিল উৎসব আয়োজক সমিতির প্রেক্ষাগৃহের বাইরের দেওয়ালে।

অবশ্যই উক্ত কাহিনির নাট্যরূপসহ দৃশ্যায়নের মাধ্যমে সম্পূর্ণ উপন্যাসটির একটি পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ নাট্যের আদল প্রদান করা হয়েছিল। পথের দাবী একটি মঞ্চ সফল উপস্থাপনা। বলতে পারি আরো কথা ওই নাটকের আখ্যানটিতে নাট্যরূপের শৈলী, শিল্পী মানুষের অভিনয়, নানান নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি, ধ্বনির অনবদ্য ব্যবহার, আলোক সম্পাত, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার দ্রুততা তদুপরি কাহিনীর মর্মবস্তুকে সমসাময়িক করে তোলবার মুন্সিয়ানার প্রাবল্য দেখতে দেখতে বারবার মনে হয়েছে যে উপন্যাসটির নাট্যরূপকার এবং পরিচালক যেন ভিতরে ভিতরে প্রতিমুহূর্তে নিমগ্ন থেকেছেন দুরন্ত স্পর্ধা-নিয়ন্ত্রিত আন্তরিক প্রতিস্পর্ধা সমৃদ্ধ নাট্য নির্মাণের নিখুঁত শৈলীতে। কেননা, সেই সময় জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে। নাট্যকার তাই ব্রিটিশ শাসিত ভারতে 'নিষিদ্ধ' একটি অন্যতর বিপ্লবী পটভূমির আখ্যানকে নাট্যবিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে তাঁর ভিতর দিয়ে দর্শক-শ্রোতার মনোজগতে চালান করে দিতে চাইছিলেন সমকালীন প্রতিবাদী রাজনৈতিক বোধকে। চম্‌কে উঠতে হয় ! নাটক দেখতে দেখতে চম্‌কে উঠেছে দর্শকমণ্ডলী বারবার। একই ভাবে তরুণমন উদ্ভাসিত হয়েছে

নাট্যক্রিয়ার পরিচ্ছন্ন বিভাসে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাট্যাগ্রাহী দর্শককুল তাঁদের আসনের হাতল আঁকড়ে ধ'রে অনেকটা ঝুঁকে প'ড়ে যতটা সম্ভব বড় বড় চোখে রুদ্ধশ্বাস প্রক্রিয়ায় ঠা-ঠা পোড়া দুপুর রোদ্দুরপ্রমাণ তেজী, প্রত্যয়ী নাট্যানুষ্ঠানটির যাবতীয় সৌন্দর্য এবং তার মর্মবস্তুকে আত্মস্থ করে নিচ্ছিলেন আপন অন্তরে।

এই পথের দাবী দেখতে দেখতেই একজন মহিলা ভাবছিলেন যে, এই নাটকের পরিচালকের পরিচালনায় যদি তিনি একটি নাটক করতে পারতেন...। এই আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয়েছিল তাঁর উক্ত পরিচালকের অন্য দু'টি নাট্য উপস্থাপনা আগে দেখবার মধ্যে দিয়ে। এই বিষয়ে কথা পরে হবে।

নাটক শেষের পরে 'হল' থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেই রাতে প্রেক্ষাগৃহের সামনের রাস্তা জুড়ে দেখা গিয়েছিল শুধু 'মানুষের ভিড়'। যাঁরা পথের দাবীর দর্শক হতে চান। সে এক হই হই কাণ্ড। ফলে আয়োজক সংস্থা পরের দিন আরও দুটো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই ঘটনা অমল গৌরবের একটি উজ্জ্বল মাইলফলক হয়ে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই গৌরব যেমন অমল চক্রবর্তীর একই সঙ্গে দামামা এবং শিলিগুড়ি শহরের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনেরও বটে।

আসলে এ এক আত্মিক যোগাযোগ, শিল্পের সাথে শিল্প-দর্শকের। জীবনে জীবন যুক্ত করার মর্মবাণী যখন কোন শিল্পের মাধ্যমে গভীর আন্তরিকতা ও নিপুণ শৈল্পিক রসে জারিত ক'রে দর্শক-শ্রোতাবৃন্দের কাছে যদি পৌঁছে দেওয়া যায় সেখানে দর্শক সমাগম হবেই। হতে হবেই। এমনই স্বচ্ছ ছিল অমল চক্রবর্তীর শিল্প ভাবনা।

পথের দাবী, দামামা-র জন্য অমলদার দ্বিতীয় প্রযোজনা হলেও তিনি কিন্তু এর মধ্যেই আরো দুটি নাটক লিখে মঞ্চস্থ করে ফেলেছিলেন এই শহরের নাট্য রঙ্গালয়ে। প্রথমটি 'প্রতিশ্রুত অভিমন্যু' এবং অন্যটি 'মামলার ফল'।

কাজেই, অমল চক্রবর্তীর এই তিনটি নাটক লেখা এবং তার পরিচালনার দুরন্ত উদ্ভাসে একজন সক্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবে আমাদের এই শহরে তখন থেকেই পরিচিত হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন। আজও তাঁর নির্মল জনপ্রিয়তা নাট্যপ্রিয় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের কাছে অটুট। কেননা তাঁর নাট্যকর্মকাণ্ড শুরুর কাল থেকে একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত উক্ত শিল্প মাধ্যমের প্রতি যে প্রীতি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সামাজিক-রাজনৈতিক দায়-দায়িত্ব, মাধ্যমটিকে সচল এবং সজাগ রাখার জন্য দক্ষ কর্মী নির্মাণ সহ সাংগঠনিক কাজে স্বেচ্ছায় তৎপর হবার মধ্য দিয়ে মানুষটি যেমন সংগঠনের ভিতরে উৎসাহের আলোকবর্তিকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন সেইসঙ্গে বাইরের সাধারণের সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশা, গল্প, ঠাট্টা-তামাশা, রসিকতা ইত্যাদির পরেও আর্তপীড়িতের পাশে তিনি তাঁর সাধ্যমত দাঁড়াতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। আর্থিক সাহায্য

করবার ক্ষমতা না থাকলেও তিনি প্রাণের তাগিদে পীড়িতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বারবার। সেই মানুষটার মানসিক শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টায়। প্রতিবাদী জীবন আদর্শের টানে গরমে-শীতে-বৃষ্টিতে অমল চক্রবর্তী মিছিলে হেঁটেছেন বহুবার। তাই অমল আজও এত জনপ্রিয়। নাট্যমহল এবং তার বাইরেও।

নাটকপ্রিয় এই মানুষটির নাট্যক্রিয়ার শুরুয়াৎ ঘটেছিল এই রাজ্যের অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার সোদপুর (অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগনা)-এ। সময়টা ১৯৬৪।

প্রথম নাট্যদল- 'সাগ্নিক', সোদপুর। প্রথম নাটক- 'দিশারী'। প্রথম নাট্যশিক্ষক- মিলন সেনগুপ্ত।

নাটকের কাজে অভিনেতা হিসাবেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই কাজ করতে করতে অমল ধীরে ধীরে নাটককার হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। সেই সময়কালটা ওই একই। ১৯৬৪। তাঁর প্রথম লেখা নাটক 'শতাব্দীর পারে'। পটভূমি —নীল বিদ্রোহ। সাগ্নিক প্রযোজিত এই নাটকটি পরবর্তীতে 'প্রায় আশিটি প্রতিবাদী নাট্যদলকে নিয়ে গঠিত সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থার কর্মসূচি হিসেবে' নকশালবাড়ি দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রচুর প্রশংসাও অর্জন করে নাটকটি। প্রয়াত নাট্যশিক্ষক উৎপল দত্ত নিজে উল্লেখিত নাটকের আলোক পরিকল্পনাতে সাহায্য করেছিলেন। মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন নির্মল গুহ রায়। সামগ্রিকভাবে সেই নাট্য অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উৎপল দত্ত স্বয়ং। সময়টা ১৯৬৮-র মে মাস। এই নাটক নিয়েই অমলদার দৃপ্ত পথচলা শুরু। সান্নিধ্য পেয়েছিলেন আরো অনেক নাট্যব্যক্তিত্বের। তাঁদের কাছে নাট্য শিক্ষা পেয়েছিলেন একেবারে কাছের থেকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানুষ ছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রজিৎ সেন। আর কলেজে পড়ার সময় থেকেই অমল নাট্যতাত্ত্বিক সাধন ভট্টাচার্য-এর খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলেন।

শতাব্দীর পারে দাঁড়িয়ে সেই সময় থেকেই অমল তাঁর কলমকে তলোয়ার করে তুলতে শুরু করেছিলেন। তখন থেকেই মানুষটি একজন বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু কোনো দলের পতাকাবাহী ছিলেন না কোনোদিন। পরবর্তীকালে নকশালবাড়িতে কৃষক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে যাবার পর সেই রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামী হলেন কিন্তু সংগঠনের সদস্য হননি কোনোদিন।

শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের নাট্যপ্রিয় মানুষজন দেখেছেন যে অমল অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে তাঁর নিজের রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তাকে প্রতিফলিত করবার জন্যই নাট্যশিল্প মাধ্যমকে বেছে নিয়েছিলেন ঐকান্তিক আগ্রহে এবং তাঁর সমস্ত নাটকের নির্মাণ ছিল নাট্যশিল্পের নান্দনিক শর্ত সমূহকে মান্যতা দিয়েই।

শিলিগুড়িতে আসার আগে এবং পরে অনেক অনেক নাটক লিখেছেন। বহু গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন। সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর নাট্য বিষয়বস্তুকে গুছিয়েছেন শিল্পের যথাযথ নান্দনিক শর্তকে বজায়

রেখেই। এমনকি অন্য নাটককারের নাটক যখন তিনি মঞ্চে হাজির করেছেন সেই সময়ও তিনি সজাগ থেকেছেন নাট্যবিষয় উপস্থাপনার সঙ্গে যেন নাট্যসৌন্দর্যের কখনও দ্বন্দ্ব না হয়।

সোদপুরে থাকতে বেশকিছু নাটক লিখেছিলেন। তার একটা তালিকা জানিয়ে রাখি- সাদাকালো, ছাড়পত্র, তাজমহল (একাঙ্ক), সরীসৃপ, হামলা প্রভৃতি। এগুলো সবই '৬৪ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে।

১৯৬৯-'৭০-এর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অমল আক্রান্ত হয়েছিলেন সোদপুর সুলেখা ওয়ার্কস-এর গেটের কাছে। সেই সময় তাঁর সুহৃদ শ্রমজীবী মানুষজনদের সহায়তায় প্রাণে বেঁচে যান। তারপরেই তিনি চলে আসেন এই শহরে। তবে দামামা'র সঙ্গে যুক্ত হন ১৯৭৪-এ।

অমল চক্রবর্তীর আদিবাড়ি ওপার বাংলার রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার কলম গ্রামে। ১৯৪৫ সালের ১৯শে নভেম্বর তাঁর জন্ম। অমলের বাবা অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। নাট্যরসিক মানুষও ছিলেন। নিজে অভিনয়ও করতেন। মঞ্চে নাটক করতে করতেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। আর মা রেবা দেবী ছিলেন অত্যন্ত স্নেহময়ী গৃহকর্ত্রী। কলম গ্রামেই কেটেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর। ওই গ্রামের উচ্চবিদ্যালয় থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করেন। পরে চলে আসেন কলকাতা শহরে। বঙ্গবাসী মহাবিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক হন। কলেজে পড়াশোনার সময় থেকেই তিনি নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত হন।

অমল চক্রবর্তীর লেখা নাটক 'প্রতিশ্রুত অভিমন্যু' প্রযোজনা করেছিল দামামা। পরিচালক ছিলেন নাটককার নিজেই। সেটা ছিল '৭৪-এর জুলাই মাস। নাটকটি এই শহরে অভিনীত হয়েছে বারবার। অভিভূত হয়েছেন বহু দর্শক ওই প্রযোজনা দেখে ! বিস্মিত হয়েছেন ! কাহিনি অচেনা নয়। মহাকাব্য থেকে আহৃত নাট্যবিষয়ের নতুন উপস্থাপনা। নাটকটির তিনটি পর্যায়ে অভিমন্যুর তিন রকমের উপস্থিতি। এক, মহাভারতের অভিমন্যু। দুই, ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবী অভিমন্যু। তিন, সমসাময়িক কৃষক আন্দোলনের একজন কৃষক অভিমন্যু, যে আধুনিক সপ্তরথীর হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার দুঃসাহস দেখায়- যাতে একালের অভিমন্যুরা আর কোনোদিন অসহায় ভাবে অস্ত্রহীন অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে না মরে।

"এই নাটক যেদিন প্রথম প্রযোজিত হল সেই দিনটি অবশ্যই শিলিগুড়ির নাট্যজগৎ তথা উত্তরবঙ্গের নাট্যজগতে একটি যুগান্তকারী দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। টাইটেল মিউজিক পড়তেই দর্শক-শ্রোতাগণ একটু নড়েচড়ে ব'সে সবাই যেন স্থির হয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ। একেবারে আলাদা গোছের একটি সুর মূর্ছনার ঝটিকা বুকের মধ্যে এসে ধাক্কা মারল।" কথাগুলো বলছিলেন বিপুলদা- "পরিচিত মানুষজনেরা মঞ্চে অভিনয় করছিল কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাদের অভিনয় ক্ষমতার আচমকা স্ফুটন ও বিস্ফোরণ দেখে।

অনুভব করছিলাম, মুগ্ধতার যাবতীয় রসবিন্দুগুলো যেন সারা শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে সুকুমারবাবুর নির্দেশনায় নাট্যানুগ সুরমূর্ছনার ব্যবহার অনবদ্য ! ধ্বনি প্রক্ষেপণ করেছিল দামামারই একজন সদস্য। এবং স্বল্প কয়েকটি আলোক প্রক্ষেপণ যন্ত্রানুষঙ্গের যথার্থ ব্যবহার ঘটিয়ে আলোক প্রক্ষেপক অনাদি দে সমগ্র নাট্য শিল্পকর্মটির সৌকর্য মাত্রা আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন। নাটক শেষে আমার / আমাদের মনে হয়েছিল , ''ভালোই হলো'। অর্থাৎ উন্নত বোধ ও আরও উচ্চতর গুণমানের নাটক দেখবার জন্য আর হাপিত্যেশ ক'রে বসে থাকতে হবে না কোলকাতার নাট্যদলের নাটক দেখার জন্য। নাটক শেষে মনে হয়েছিল সময়টা কি করে পেরিয়ে গেল টেরই পেলাম না। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এর আগের দু-একটি নাট্য প্রযোজনা বাদ দিলে এই প্রথম শিলিগুড়ির নাটক আধুনিকতার স্পর্শ পেল অমল চক্রবর্তীর হাত ধ'রে।''

আর এই সম্পর্কে সমর চক্রবর্তী লিখেছেন- 'একসময় আলোড়ন তোলা 'মারীচ সংবাদ'-এর সংবাদ ভালো লাগেনি যাদের, তাদের অনুরোধে অমল লিখেছিলেন 'প্রতিশ্রুত অভিমন্যু'। পরাজয়ের নয়, পরাক্রমের.... তাঁর সমসময়ের লড়াকু স্বপ্নকে মূর্তি এবং স্ফূর্তি পেতে দেখলেন। দেখলেন এবং দেখালেন। আমরা দেখলাম একই আঙ্গিকের আদলে সংবাদ এবং সংবেদের বদলে যাওয়া.... সংলাপের কাব্যিকতা, অন্তর্লীন গীতলতা, অনচ্ছ আবরণ নয়, নাট্যবস্তু এবং দর্শকদের মাঝখানে অদীক্ষিত দর্শকও স্পৃষ্ট স্পন্দিত হয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে।'

দামামা-র পার্থ চৌধুরী জানিয়েছেন- 'অমল চক্রবর্তীর এই নাটকের সূত্র ধরেই আমরা দামামা'র কর্মীরা জানতে শুরু করলাম যে গ্রুপ থিয়েটার কী। তার নাট্যক্রিয়ার গঠন কেমন হবে। নাট্যান্তরে কেমন তার চলন হবে, কেমন তার নির্মাণের প্রক্রিয়া হবে; এসব অনেক কিছু জানলাম। প্রম্পট শুনে নাটক করার যে অভ্যেস ছিল সেগুলো বন্ধ হল। আগে যে উচ্চকিত বা চিৎকৃত স্বরে এক ধরনের সংলাপ উচ্চারণের ধরণ-ধারণ ছিল সেগুলো বন্ধ হল। একইসঙ্গে সংগঠনের শৃঙ্খলা এলো। বলা যেতে পারে অমলদার নিরলস প্রচেষ্টায় দামামা ধীরে ধীরে প্রকৃত গ্রুপ থিয়েটার হয়ে উঠতে শুরু করল। আধুনিক থিয়েটারের যে নাট্যকর্মধারা আমরা তার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে অমলদাই আমাদের হাত ধরে সেখানে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। আমরা তার কাছেই শিখেছি—চিন্তাশীল, ভাবগম্ভীর, গুরুত্বপূর্ণ, বৃহত্তর জনসমাজের প্রতি আন্তরিক এবং যথার্থভাবে সময়োপযোগী নাট্যক্রিয়াকর্মের দিকে কি ক'রে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে যেতে হয়। ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে শুরু করলাম দামামা যেন প্রকৃত ছন্দ পেতে শুরু করেছে একটি দীর্ঘ নাট্যপথ পরিক্রমার।'

অমল চক্রবর্তীর সমস্ত নাটকই লেখা তাঁর নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করবার জন্যই.... এবং নাট্যশিল্পের নান্দনিক শিল্পশর্ত মেনেই। দামামা, অমলের এই বোধকে স্বীকার করে নিয়েছিল বলেই তারা

এই শহরের বুকে, এমনকি সমস্ত উত্তরবঙ্গে সাতের দশকের শেষ দিক থেকে একটি অগ্রণী নাট্যদল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। ফলে, সাতের দশকে যে সমস্ত নাট্যদলকে একের পর এক গড়ে উঠতে দেখা গেল তাদের সকলের কাছেই দামামা একটি আদর্শস্থানীয় নাট্যসংগঠন হয়ে উঠতে লাগল। যার কেন্দ্রে ছিলেন অমল নিজেই।

এরপরই শুরু হয়েছিল 'তাজমহল' নাট্য নির্মাণের ভাবনা। এই নাটকটি লেখা হয়েছিল অনেক আগেই একাঙ্ক আকারে কিন্তু নাটককার নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন এখানে এসে। এই শহরে। শ্রদ্ধেয় নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যপরিচালক স্বপন চক্রবর্তী (বর্তমানে প্রয়াত)-এর বাড়িতে বসে। কথায় কথায় জানা গেছিল যে তাজমহল (পূর্ণাঙ্গ) নাটকটির বেশিরভাগই তাঁদের বাড়িতে বসে লেখা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পথের দাবী দেখতে দেখতে যে মহিলাটি আবেগ ও আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন অমলের পরিচালনায় নাটক করবার জন্য তিনি , মমতা চক্রবর্তী। তাঁর ইচ্ছেটা বাড়িতে পেশ করতেই খবরটা যথাস্থানে পৌঁছে যায়। অমল চক্রবর্তীসহ সুকুমার চন্দ্র আসেন মমতা বৌদির ঘরে। গানের পরীক্ষা নেন। অমলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মমতা বৌদি দামামা'র সাথে যুক্ত হন। এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল এ কারণেই যে, ওই নাটকে একজন অভিনয় জানা সুদক্ষ গায়িকার প্রয়োজন ছিল বলেই। উপরোক্ত নাট্যে মমতা চক্রবর্তী 'লক্ষ্মী' চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দামামার'র সাথে একসঙ্গে পথ চলা শুরু করেন। থেকেও গেছিলেন সেখানে দীর্ঘদিন। সেই সময় অমল চক্রবর্তী এবং দামামা এক এবং অভিন্ন।

তাজমহল নাটকটির প্রথম শো হওয়ার পরপরই শিলিগুড়ি কলেজের টিচার্স রুম থেকে শুরু করে শহরের রাস্তাঘাট, চা-এর দোকানে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এই নাটক নিয়ে। সকলেরই ভালো লাগত এমন তর্ক-বিতর্ক শুনতে। তবে সেই সময়ে একটা বিষয় বোঝা গেছিল যে চোখের সামনে যা ঘটে সেটাই কেবল একমাত্র সত্যি নয়। সত্যি লুকিয়ে থাকে গোপনে, রাতের অন্ধকারে কিংবা নির্জন কক্ষে বা আরও কোনো কোনো নির্জনে, আমাদের চোখের আড়ালে। তার্কিকেরা বইপত্র ঘাঁটছিলেন। তারা খুঁজছিলেন ইতিহাসে লিখিত সত্যিকে। কিন্তু শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিতে অবলোকিত সত্যিকে সেই তার্কিকেরা কোনো মতেই খুঁজে পাননি। তাই তাজমহল-এর নাট্যকারকেও স্বীকৃতি দিতেও চাননি সেই তার্কিক মানুষেরা।

না দিক। তবে শিলিগুড়িতে হয়ে যাওয়া 'তাজমহল'কে ঘিরে মহা মহা পণ্ডিতের বিতর্ক — তাদের গলার স্বর উচ্চনাদে পৌঁছে দিয়েও স্তব্ধ করতে পারেননি তারা ওই নাট্য প্রযোজনাকে। বিতর্ক বরং বাড়িয়ে দিয়েছিল নাট্য মঞ্চায়নের সংখ্যা। ফলে বহু স্থান- স্থানান্তরের মানুষ দেখতে পেয়েছিল সেই নাটক। ধন্যবাদ তার্কিক মহাশয়গণ ! তবে, একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো, তাজমহল বিতর্কিত কেন ? এই নাটকের নাটককার তাঁর

নির্মিত নাটকের মধ্য দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, জাহানারার সঙ্গে শাজাহানের একটি অন্য সম্পর্ক ছিল। বাইরের থেকে শাসক শ্রেণি বা শোষকের কোনো কোনো সময় আপাত কিছু পরিবর্তন ঘটলেও তাদের অন্দরমহলের নোংরামি বা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যভিচারের যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না তারই একটা খোঁজ দেবার চেষ্টা করেছিলেন নাটককার এই নাট্যে।

নাটকের ব্যানারে লেখা হ'ত, 'ইতিহাসের নব মূল্যায়ন'। এটা নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের এক অধ্যাপক জানতে চান অমলের কাছে, শাজাহানের সঙ্গে জাহানারার সম্পর্কের ঘটনাটি তিনি কোথায় পেলেন? অমল বলেন যে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে একটা বই এনেছিলেন এবং সেটা পড়তে পড়তেই তিনি বিষয়টি পেয়েছেন। তখন তারা দিল্লিতে ইসলামিক হিস্ট্রির হেড অফ ডিপার্টমেন্টকে জানান যে, জনৈক অমল চক্রবর্তী তাঁর নাটকে জাহানারার চরিত্রকে 'এইভাবে দেখিয়েছে' , ঐতিহাসিক সত্যতা কি জানান। সেখান থেকে জানানো হয় , 'এটা অতি সাধারণ বিষয়, আপনারা টড- এর ইতিহাস পড়ুন (Annals and antiquities of Rajasthan)। আর সেটা না পেলে 'জাহানারার আত্মকথা' পড়ুন।' এই কথাগুলো কর্ণিকের নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা বিনায়ক দেব একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন।

শিলিগুড়ি শহরের মুক্তমঞ্চ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই অমল যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর প্রতিভা, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা এবং লড়াকু মানসিকতার গুণে তিনি মুক্তমঞ্চ সংগঠনে প্রথম শ্রেণীর কর্মীমানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। নাটক লেখা আর নাটক বিষয়ক ভাবনায় অমল আরো গভীর মনোনিবেশী হন। নাট্যসংযোগ বাড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে তিনি উত্তরবাংলার অন্যতম প্রধান নাটককার ও নাট্যব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত হন। কখনও অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবেও নাট্য নির্দেশনার কাজ করেছেন। মুক্তমঞ্চ'র যৌথ নাট্যপ্রয়াসে 'গর্ভবতী জননী', 'মে দিবস', 'ত্রিংশ শতাব্দী'র মতো শক্তিশালী নাট্য নির্মাণে তিনি ব্রতী হয়েছেন।

শিলিগুড়িতে আসার পরে পরপর তিন-চারটি নাটক পূর্ণ সফলতার পাওয়ার ফলে তাঁর নাটক লেখার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। তাই নাটক লেখার কাজ চলতেই থাকে। চলতেই থাকল। উপরে আলোচিত তিনটি নাটক লেখার পর তিনি লিখলেন —

স্বপ্নলোকে রাজাপ্রজা, সোনাডাঙার আহাম্মক, সাতরঙ সূর্য্য, নীল আকাশে রক্তরাগ, ছায়ামুখ, যুদ্ধের মুখোমুখি (পরিবর্তন, পরিবর্ধনের পর তা 'খুঁজে ফেরা'), অনির্বাণ, পেশকারের বিচার (পূর্ণাঙ্গ), সূর্যাস্তের পাঠ, যা চাই, বুড়িমা, দংশিত চাঁদ। এই নাটকগুলি তাঁর মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সম্ভার।

ছোট নাটকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয় , মুচকি হাসে হাঁদুর হৃদয়, রাজার গাজন গাঁজাখুরি, মঞ্জরী, বাড়ির

নাম রত্ন পুরী, ফানুস, রামরাজত্বে, কলাবতী, খড়কুটো, ভগ্নমানুষ, পেশকারের বিচার (একাঙ্ক), গণেশ দর্শন এবং তারা (একক অভিনয়ের নাটক) ইত্যাদি।

অমলকৃত দেশি, বিদেশি বহু গল্পের নাট্যরূপায়ণ শিলিগুড়ির নাট্যপ্রিয় মানুষদের মুগ্ধ করেছে। যেমন মামলার ফল, পথের দাবী, ক্রন্দসী, স্বপ্নের জয়, আমার নাম ৪৫, পুরস্কার, বৌ, ভূতুড়ে কন্যা, বসুন্ধরা, কুড়ানি, স্যাঙাৎ, হৃদপিণ্ড, ভেট জমিন, খুড়োর কল, সহমরণ, পথের পাঁচালী নাটকগুলি সন্দেহহাতীতভাবে বাংলা নাট্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

আকাশবাণীর জন্য লেখা নাটক , একফালি রোদ্দুর, বেহুলার বিয়ে, কুশের পুতুল, ভ্রম সংশোধন আমাদের মন ছুঁয়ে যায়। এই সব ক'টি নাটকই আকাশবাণী শিলিগুড়ি থেকে প্রচারিত হয়েছিল। আর শেষ বেতার নাটক 'মধুমন্তীর ঘর' একসময় একই দিনে আকাশবাণী শিলিগুড়ি, কোলকাতা, শিলচর এবং আগরতলা থেকে সম্প্রচারিত হয়েছিল। (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দ ভট্টাচার্য, ইঙ্গিত নাট্য সংস্থা)

এছাড়াও কিছু অসমাপ্ত নাটক রয়ে গেছে; সৈনিক (পূর্ণাঙ্গ), মনসা (পূর্ণাঙ্গ), চড়ুই (পূর্ণাঙ্গ), সুলেখার স্বপ্ন (একাঙ্ক)।

শুধু নাটক লেখা নয়, নাট্য বিভাগের যে কোন বিষয়ে তিনি যে অসাধারণ পারঙ্গম ছিলেন তার পরিচয় আমরা বারবার পেয়েছি। বাস্তবিক, অমল নিজেই একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান।

তাঁর লিখিত নাটকের সংখ্যা পঞ্চাশ-এর উপরে। ছাপা নাটকের সংখ্যা খুব কম। 'শতাব্দীর পারে' নাটকটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গণ-আন্দোলনের একাংক সংকলনে জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়া প্রতিশ্রুত অভিমন্যু, মুচকি হাসে হাঁদুর হৃদয়, মঞ্জরী, খুড়কুটো এবং কুড়ানি ছাপা হয়েছে অভিনয় পত্রিকায়। গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় ছাপা হয়েছে মাত্র একটি নাটক, 'পুরস্কার'।

অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে অমল চক্রবর্তী জানিয়েছেন— 'আমার এখানে নাটক শুরু করার আগে অনেকটা সময় অতিক্রম করেছে শিলিগুড়ি শহর। অনেক নাটক হয়েছে। মৌলিক নাটকও প্রযোজিত হয়েছে। আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে সত্তর দশকের আগে দুটো নাট্যধারা বহমান ছিল শিলিগুড়িতে। 'মিত্র সম্মিলনী'-কেন্দ্রিক এবং 'কথা ও কলম'-কেন্দ্রিক। কথা ও কলম স্থানীয় বেশ কিছু নাটককারের নাটক করেছেন। তাঁদের মধ্যে যে নামগুলো ঘুরেফিরে এসেছে তাঁরা হলেন , শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির দাশগুপ্ত, প্রতাপ চক্রবর্তী এবং অসিত ভট্টাচার্য। এঁরা লিখেছেন কিন্তু কোন নাটকই পড়বার বা দেখবার সুযোগ হয়নি। এখনো যাঁরা লিখছেন তাঁদের নাটকও আগামী প্রজন্ম পড়তে পারবেন এমন ঘটনা ঘটবে না। মুদ্রিত নাটক এ শহরের কোন নাট্যকারের আছে বলে আমার জানা নেই। কিছু নাট্য পত্রিকাতে কখনো কখনো ছাপা হয় বটে

কিন্তু সেগুলো সংরক্ষিত হয় না। কোন্ গ্রন্থাগারে এই শহরের কোন্ নাট্যকারের নাটক সংগৃহীত হয়েছে, তা পত্রিকা আকারে হোক বা পুস্তককারে, না— নেই। তেমন উদ্যোগও নেই।'

অমল এত এত নাটক লিখলেন, প্রযোজনাও হল তার অথচ এই নাট্যসম্ভারের পাণ্ডুলিপিগুলি কোথায় ? কার কাছে আছে ? সে কথা আজও শিলিগুড়ির বহু নাট্যপ্রিয় মানুষ সহ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। যাঁর কাছে যতটুকু রয়েছে সেগুলো খুঁজেপেতে সংগ্রহ করে যদি ছাপার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শুধু শিলিগুড়ি নয়, বাংলার সমস্ত নাট্যপ্রিয় মানুষ সে সকল নাটকের বিষয়বস্তুতে অন্যরকম স্বাদের সন্ধান পেয়ে যাবেন। বিষয়টির উদ্যোগ নেওয়া খুব জরুরি।

'অমল চক্রবর্তী পুরস্কার পেয়েছেন প্রচুর। অনেকানেক সংবর্ধনাও পেয়েছেন।' পার্থ চৌধুরী জানাচ্ছেন, 'সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বর থাকলেও মানুষটিকে গুরুত্ব দেবার অগ্রাধিকার লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু ১৯৯৫- এর ২৫ থেকে ৩০ এপ্রিল-এ আয়োজিত 'নাট্যনিমগ্নতায় তিন দশক'-এ প্রস্ফুটিত হয়েছে অমল নাট্য জীবনের প্রথম যথার্থ স্বীকৃতি। একজন নিবেদিত প্রাণ নাট্যকর্মীকে সম্মান জানানোর জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোনো পন্থা হতে পারে না। তিনি উল্লেখ করেছেন এই নাট্য উৎসবের আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'উত্তাল' তাদের নাট্য পরিক্রমার একটি উল্লেখযোগ্য কাজের সংযোজন ঘটালো। এমন একটি প্রয়াসের জন্য আমরা (দামামা) তাদের মনে রাখতে বাধ্য রইলাম।' এই উৎসবে ছ'দিনে অমল চক্রবর্তীর লেখা মোট সাতটি নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। নাটকগুলি যথাক্রমে , খুড়োর কল (উত্তাল), স্বপ্নের জয় (উত্তাল), আমার নাম পঁয়তাল্লিশ (ঋত্বিক), খড়কুটো (কলাকুশলী, জলপাইগুড়ি), পুরস্কার (মহুয়া), মামলার ফল (কর্ণিক) ও তাজমহল (দামামা)।

অমল চক্রবর্তী কোনোদিনই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন না। এক সময় ছাত্র পড়াতেন। শহরের একটি বড় দোকানে হিসাব লেখার কাজ করতেন। আর কখনো অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবগুলোর থিয়েটার পরিচালনা করে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক পেতেন। এইভাবেই অত্যন্ত দীনের ন্যায় তাঁর পরিবার চলত। বহু মানুষ সাহায্য করতে চাইতেন কিন্তু সকলের কাছ থেকে তিনি হাত পেতে অর্থ সংগ্রহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

শেষমেশ যখন দংশিত চাঁদ লেখা হচ্ছে তখন বা তার আগে থেকেই তিনি পার্কিন্সন রোগে ভুগতে শুরু করেছিলেন। তবু অমল জানতেন , যে কোনো যত্নবান আন্তরিক শিল্পীর শিল্প জীবনে বারবারই মনে হতে পারে যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে, গুরুত্বের সঙ্গে কেউ যদি কোনো সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকে তবে সে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে নিজের অন্তরকে যেমন বিস্তৃতি দিতে পারে তেমনি বহির্জগতেও একইভাবে নব নব সৃষ্টিরূপ নির্মাণ করতে পারে অনায়াসে। সে জন্যই আমরা জানতে পারি একজন (পার্থ

চৌধুরী) কোনো একটি নাটক (দংশিত চাঁদ)-এর পারস্পরিক দৃশ্যপট বুঝিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ কোন্ কোন্ দৃশ্যে কোন্ কোন্ চরিত্র প্রবেশ করবে এবং কোন্ নাট্যাংশ ও নাট্য বিষয়ের কিভাবে পরিণতি ঘটবে। আর অন্য একজন (অমল চক্রবর্তী) সে সময় গভীরভাবে অসুস্থ তবু তিনি ওই অবস্থাতেই পার্থ-র গুছিয়ে দেওয়া দৃশ্যপটে অনুপ্রবেশ ও প্রস্থান ঘটাচ্ছেন পার্থ নির্দেশিত চরিত্রগুলির। অমল চরিত্রগুলির মুখে সংলাপ বসাচ্ছেন। আর উজ্জয়িনী, দামামার এক নাট্যকর্মী প্রতি রবিবার অমলের বাড়িতে বসে দংশিত চাঁদের শ্রুতি লিখছেন। অবশ্যই এই নাট্য লিখন পদ্ধতি এক মহাভারতীয় উপস্থাপনা। নাটকটি পরীক্ষামূলক নাটক ছিল। প্রাচীন গ্রীক নাটকের ধ্রুপদী ঘরানায় লিখিত হয়েছে নাটকটি। ব্যবহার ঘটেছে কোরাসের। মাঝে মাঝে মূল নাটক থেকে বেরিয়ে এসে ছুটকারার দল একেবারে সমসাময়িক সমস্যা, যন্ত্রণা ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে। এই ঘরানা অবশ্যই বাংলার ভাসান গানের রীতি।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির অর্থানুকুল্যেই প্রযোজিত হয়েছিল এই নাট্যানুষ্ঠান বার্টোল্ট ব্রেশটের জন্ম শতবর্ষে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির পক্ষে ওই নাটক দেখতে এসেছিলেন নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। শোনা যায় নীলকণ্ঠবাবু নাটকটি দেখে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন।

এত প্রীতি, এত ভালোবাসা, এত সফলতা, এত পারস্পরিক সহযোগ দামামার নাট্যকর্মীদের সঙ্গে অমলের; তবু অমল চক্রবর্তীকে অবশেষে দামামা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়।

কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর আজও জানা যায়নি।

তাঁকে শহর ছেড়ে উত্তরায়ণের একেবারে প্রান্তে একটি আবাসনে চলে যেতে হয়। নাকি যেতে বাধ্য হন। তখনও তিনি অসুস্থ তবু, তারমধ্যেই গড়ে তোলেন 'নবদল'। একটি নাটকের দল। ২০০৫-এর জুন/জুলাই মাসে। নবদল তৈরির পর প্রথম প্রযোজনা 'গণেশ দর্শন'। নাট্যকার এবং পরিচালক অমল চক্রবর্তী। নবদল তৈরি হওয়ার আগে একটি একক অভিনয়ের নাটক লেখেন। নাটকটির নাম 'তারা'। এই নাটকটি শিলিগুড়িতে যেমন প্রযোজিত হয়, তেমনি অমলের নিজের মাটি সোদপুরেও অনুষ্ঠিত হয়। মাথাভাঙার সারস্বত উৎসবেও সম্পা নামের একজন অভিনেত্রী নাটকটি উপস্থাপন করেছিলেন। নবদল-এর উল্লেখযোগ্য এবং সবশেষ প্রযোজনা 'পথের পাঁচালী"। বিভূতিভূষণের কাহিনী অবলম্বনে অমল চক্রবর্তীর আরও একটি অবিস্মরণীয় নাট্যরূপ। নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল দীনবন্ধু মঞ্চে। ২০০৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে। আর কলকাতার রবীন্দ্র সদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৮-এর ৯ মার্চ। সেদিন প্রচুর প্রশংসা বাক্য বর্ষিত হয়েছিল পথের পাঁচালী নাট্য অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। নাটকটির মোট পাঁচটি শো হয়েছিল। চারটি এই শহরে, অন্যটি কলকাতায়। দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত পথের পাঁচালীর দৃশ্যগুলি পরপর আজও বহু দর্শকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

আর ঐ ২০০৮-এর নভেম্বর মাসের ৫ তারিখে তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

তবু, ভস্ম ফুঁড়ে ফিরে ফিরে আসেন তিনি অমল-প্রিয় মানুষজনদের মাথার ভিতরে। এ শহরের বড় রাস্তায় ঠা-ঠা পোড়া রোদের মধ্যে কখনো কখনো যেন অমলের হদিশ পেয়ে যান তাঁরা। দেখতে পান অমলকে এ শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতে। দেখতে পান প্রতিবাদী মিছিলে, মিত্র সম্মিলনী, দীনবন্ধু মঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে অথবা কোনো নাট্য সমারোহের উদ্বোধনী বক্তৃতা মঞ্চে। আর...

স্মৃতিপটে ঘুরপাক খায় 'প্রতাপ'-এর অমল উচ্চারণে একটি অমলিন গীতা শ্লোক ঃ

'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। ৩৭।। দ্বিতীয় অধ্যায়।।

তথ্যসূত্র ঃ

স্মারক গ্রন্থ — অমল চক্রবর্তী, নাট্য নিমগ্নতায় তিন দশক, উত্তাল
স্মারক গ্রন্থ — রজত জয়ন্তী বর্ষ, ইংগিত
স্মারক গ্রন্থ — দামামা ৫০, ২০২২-২৩
আশংশু, সাময়িকপত্র ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

জীবনরসিক সমর চক্রবর্তী ... সকলজনপ্রিয় সমরদা...

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

''তখন দুপুর, জানালায় আঁকা চৌকো
আকাশে ভাসছে মলিন মেঘের নৌকো
বৃষ্টিগন্ধে ডুবছে স্মৃতির মৌন
শব্দ যা কিছু বাহ্য এবং গৌণ ...''

বহুবার প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতিভঙ্গের পর এক বৃষ্টিগন্ধী দুপুরে যখন নিজের পত্রিকায় কবিতা পেতে নাছোড় আমি, তখন চোখের সামনে দেখেছিলাম সমর চক্রবর্তীর পাঁচ স্তবকের একটি কবিতাকে হয়ে উঠতে, যার সূচনার পংক্তিগুলি উদ্ধৃত হল। লেখা পাওয়া নিয়ে সমরদার কাছে এরকম দীর্ঘ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে, কিন্তু লেগে থাকতে পারলে শেষ পর্যন্ত যে কবিতা (সমরদারই কথায়) প্রসব করতে পারতেন তিনি তার দ্যুতি চিনিয়ে দিত স্রষ্টার প্রতিভাকে। এই লেখার তাগাদার সূত্রেই মনে পড়ে সমরদার শিশুসুলভ ছলনার কথা। বহুবার ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত, নিজেও যখন আর প্রতিশ্রুতি দিতে লজ্জিত হচ্ছেন তখন একদিন দরজায় আমার সাড়া পেয়েই সংহতি মোড়ের ভাড়াবাড়ির ভেতরের ঘরটায় একটা কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়েছেন, সেই পরিচিত ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন— ''এই, তোমার লেখাটা নিয়েই বসেছি।'' নিপাট সাদা কাগজ সাক্ষ্য দিচ্ছে সমরদার শিশুসুলভ মিথ্যের। সমরদা এরকমই। মৃণাল সেন শিলিগুড়িতে এসেছেন। আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার নেবেন সমরদা। সঙ্গী আমি আর আমার এক বন্ধু, যার (সেকালে দুর্মূল্য) টেপ রেকর্ডার আছে। মৈনাক ট্যুরিস্ট লজের ঘরে আমরা সেদিন নিছকই সঙ্গী, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছি মৃণাল সেন আর সমরদার গভীর আলোচনা আর ভাবছি, সমরদার চলচ্চিত্র-জ্ঞানও এতটাই .... । সেই টেপরেকর্ডার থেকে সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা তৈরি করে দিতে হবে পত্রিকায় ছাপার জন্য। কিন্তু যথারীতি সমরদা তারিখ পে তারিখ দিয়ে চলেছেন। পত্রিকা প্রকাশের আর বিলম্ব করা চলে না কিছুতেই। প্রচণ্ড ক্ষোভে একদিন বললাম, আপনার লেখার প্রয়োজন নেই, আপনার লেখা ছাড়াই বেরোবে পত্রিকা। তখন ভাঙা পায়ের প্লাস্টার সদ্যই কাটা হয়েছে। সেই অবস্থায় তিন-চারদিন পরে একজনের সাইকেলের সামনের রডে বসে আমার বাড়িতে এসে লেখাটা পৌঁছে দিয়েছিলেন। চোখে জল এসে গিয়েছিল নিজের রূঢ় ব্যবহার স্মরণ করে। কিন্তু সমরদা সেই চিরপরিচিত অমলিন হাসিতে উজ্জ্বল। ঋত্বিক নাট্যসংস্থার আমন্ত্রণে শহরে এসেছেন চেক রিপাবলিকের নাট্যদল। নির্দেশক ইগর সামাতিনি-র সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে — এখানেও অবলম্বন সমরদা। এবার অবশ্য অনুলিখন দিতে খুব বেশি দেরি করেন নি।

সমরদা শহর শিলিগুড়ির ভূমিপুত্র নন। ২৪ পরগণার বিদ্যানগর স্কুল থেকে সিউড়ি হয়ে বোলপুর বিশ্বভারতীতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পড়াশুনো শেষ করার পর বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের (এই সাতের দশক না সত্তরের দশক তা নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে সমরদার সঙ্গে) ঠিক মাঝখানে কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে আসেন সমর চক্রবর্তী এবং তখন থেকেই তিনি এই শহরের আপনজন। উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের সরস্বত এবং সৃজন-সমাজে যাঁদের জন্য শহর শিলিগুড়ির পরিচিতি, তাঁদের একজন ছিলেন অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার, অন্যজন সমর চক্রবর্তী (এক্ষেত্রে অধ্যাপক শব্দটির না-ব্যবহার ইচ্ছাকৃত, ব্যাখ্যা পরে লভ্য)। অশ্রুকুমার সিকদার ছিলেন দীপ্ত সূর্য, তিনি সকলের স্যার বা সসম্ভ্রম অশ্রুবাবু। আর সমর চক্রবর্তী স্নিগ্ধ চন্দ্রমা, ছেলে-বুড়ো সকলেরই সমরদা, সকলেরই ইয়ার। আড্ডায় তাঁর দ্বার অবারিত। সময়ের কোনো বাঁধাবাঁধি সেখানে নেই। যে কোনো অনুষ্ঠানে তিনি যে দেরি করে আসবেন তা ছিল অবধারিত কিন্তু নিজেই বলতেন, 'একবার এসে গেলে আর যাবার কোনো তাড়া নেই।' এই দেরি প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, তিনি যখন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি পদে আসীন তখন এরকম দেরির কারণেই ট্রেন মিস করেন এবং অতঃপর কোলকাতার দরকারি সভায় যোগ দেবার জন্য সংসদের লজ্‌ঝড়ে অ্যাম্বাসেডর গাড়িতে চড়েই রওনা দেন, যে যাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাকে পরে শুনিয়েছেন সংসদের গাড়ির চালক সোনাদা। সম্ভবত সেবারই কোলকাতায় বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে তিনি আবার পা ভাঙেন। বাথরুম ব্যাপারটা তাঁর প্রত্যাশীদের ক্ষেত্রে বরাবরই ভয়াবহ। তখন (বিশ শতকের নয়ের দশক) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পর্যায়ে শেষ করে সদ্য আয়োজকের ভূমিকায় উন্নীত হয়েছি, সেইসময় প্রথম যেদিন আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারক সমরদাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসার দায়িত্ব পেয়েছিলাম, সেদিন জেনেছিলাম বাথরুমের ভয়াবহতা। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, বাথরুমে গেছেন। অপেক্ষা করব শুনে একটু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন কাবেরীদি। ঝাড়া দুটি ঘন্টা অপেক্ষার পর যখন তিনি বেরোলেন তখন উপলব্ধি করলাম দিদির অবাক দৃষ্টির তাৎপর্য। এরপর থেকে বহুবারই বাথরুম ঢুকে যাবার আগে একরকম 'তুলে আনতে' বাধ্য হয়েছি। আরো পরে যখন বিচারক হিসেবে একাসনে বসার ধৃষ্টতা দেখাতে শুরু করেছি তখনও একসঙ্গে যাতায়াতের সুবাদে এরকম বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিচারক হিসেবে আবৃত্তিকারদের বাচনকৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে (তখন প্রতিযোগিতার শেষে এরকম বলার চল ছিল) কবিতার যে গভীর ব্যাখ্যা শুনেছি তা শ্রেণিকক্ষ-শিখনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বিষয় হিসেবে ইংরেজির ছাত্র ছিলাম না বলে সমরদা আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষক হয়তো নন, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে দু'হাত ভরে নিয়েছি তাঁর থেকে। তিনি আমার শিক্ষকপ্রতিম নন, প্রকৃত অর্থেই শিক্ষক।

সমরদা পেশায় অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু তিনি অধ্যাপকসুলভ ছিলেন না। সাধারণভাবে যে কোন অধ্যাপকের 'স্টাডিরুমে' সুসজ্জিত যে গ্রন্থরাজি লক্ষিত হয়, সমরদার ঘরে তা দেখিনি। অথচ যে কোন বিষয়ে দীর্ঘ সময় নিরবচ্ছিন্ন বলে যাবার আকর তিনি সংগ্রহ করতেন কোথা থেকে তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। মনে আছে, সেই

বহুকাল আগে 'শীতের কবিতা কবিতায় শীত' শীর্ষক রেডিও টক প্রস্তুতির জন্য যখন তাঁর সহায়তা প্রত্যাশায় যাই তখন কী সাবলীলভাবে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে বিনয় মজুমদার পর্যন্ত কবিরা কীভাবে শীতকে দেখেছেন তার অনুপুঙ্খ উল্লেখ করে গেলেন ধারাবাহিকভাবে। শহরের কবি-সম্পাদক শুভময় সরকার এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেন, 'সমরদার একটা অদ্ভুত ফটোগ্রাফিক মেমরি ছিল', যে কথা তিনি নিজেও স্বীকার করতেন। সেই মেমরিই ছিল তাঁর মুখ্য অবলম্বন— আলোচনায় কিংবা বক্তৃতায়। অবসর গ্রহণের পর যখন বিভিন্ন আসরে তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে 'ভূতপূর্ব অধ্যাপক' শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হত তখন নিজেকে নিয়ে রসিকতায় সিদ্ধবাক্ সমরদা বলতেন, আমি যথার্থই ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কারণ অধ্যাপনাটা কোনদিনই করিনি। কিন্তু যাঁরা সমরদার ছাত্র-ছাত্রী তারা জানেন সমরদা যেদিন পড়াবেন সেদিন জগতের আর সব কিছু লুপ্ত, সেদিন তিনি মগ্ন তাপস।

ছন্নছাড়া এক আউল-বাউল জীবন যাপন করেছেন সমরদা। শুভময় বলেন — 'বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে পছন্দ করতেন সমরদা'। অঙ্ককষা যে জীবন সে জীবনের সঙ্গে সতত বিরোধ ছিল তাঁর। অধ্যাপক তো বটেই, অনেক কবিও যখন অঙ্ককষা জীবনে অভ্যস্ত, তখন সমরদা দেখিয়েছেন জীবনের বিপজ্জনকতা কীভাবে সৃজনসহায়ক হয়ে ওঠে। জীবনের রসদের খোঁজে তিনি ছিলেন নিয়ত সঞ্চরণশীল এবং জীবনরসে আকণ্ঠ ডুবে থাকা একজন মানুষ। এই জীবনরস তিনি আহরণ করেছেন সমাজের বহু বিচিত্র মানুষের নিবিড় সাহচর্যে। কেবল বুদ্ধিজীবী বা সৃজনশীল ব্যক্তি নয়, নিখাদ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি থেকে শুরু করে রিকশ চালক পর্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিল তাঁর অন্তরের যোগ। সদাহাস্যময় সমরদা শুধু হাসি দিয়েই যেন উড়িয়ে দিয়েছেন জীবনের যাবতীয় সমস্যা। তাঁর রাগত অভিব্যক্তি সুদুর্লভ। স্মৃতির ভাঁড়ারে এরকম অভিব্যক্তি বহু সন্ধানেও মেলে না।

মধ্যরাতের শিলিগুড়ি শাসন করার অধিকার ছিল একমাত্র সমরদার। যত রাতই হোক না কেন, নির্জন এবং নিঃশব্দ শিলিগুড়ির রাজপথে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়ে যেত সমরদাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার কোন না কোন উপায়। যাঁরা মধ্যরাতে শহরে সঙ্গী হতেন সমরদার তাঁদের অনেকেরই ভাঁড়ারে আছে এরকম অভিজ্ঞতা যে, টহলদারি পুলিশভ্যান সযত্নে সমরদাকে পৌঁছে দিচ্ছেন গন্তব্যে। এত অগোছালো এবং জীবন-উদাসীন হয়েও সমরদার অদ্ভুত মমতাবোধ ছিল সন্তান এবং পরিবারের প্রতি। পিতা-মাতা বেঁচে থাকা অবস্থা থেকে উত্তরকাল পর্যন্ত বারংবার লক্ষ করেছি সেই মমত্ববোধ।

PUN-বিলাস ছিল সমরদার বাক্যবিন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ। বহুজনের স্মৃতিতে এরকম বহু বিলাস সঞ্চিত হয়ে আছে। যেমন, শিলিগুড়ির একটি নাট্যদল তাদের নাট্যোৎসবের DONOR CARD নেবার জন্য অনুরোধ জানালে সমরদার সপ্রতিভ উত্তর, 'ডোনার কার্ড আমি নেব কেন, ও তো নেবে সৌরভ'। সমরদা যখন সিসিএন-এ কিছুদিনের জন্য যুক্ত তখন অন্যতম ডিরেক্টর তথা শিলিগুড়ির জনপ্রতিনিধি সুজয় ঘটক (কালা) একবার তাঁকে বলেন, যে লোক দেখি সবই তো আপনার লোক। সমরদার প্রতি-উত্তর, ''আর সব টিভি-ই যে 'কালা'-র টিভি''। সারাদিনব্যাপী একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে আসার পর দুপুরের আহারে প্যাকেটস্থিত খাবার দেওয়া হলে তা খেতে

গিয়ে যখন পাঞ্জাবীতে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাঁর সহাস্য উক্তি, 'ভাত ছড়ালে কেবল কাক নয়, কাকুরও অভাব হয় না' (যেহেতু তিনি ছিলেন আমার কাকুর বন্ধু)। সমরদার সাহচর্য যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা সকলেই কমবেশি এরকম PUN-এর সঙ্গে পরিচিত। রমারঞ্জন চক্রবর্তী এবং সন্ধ্যা চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সমরদা সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন তাঁর দাদু প্রমদারঞ্জন চক্রবর্তীর কাছে। দাদু সংস্কৃতের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন, আর বাবা তাঁর সংস্কৃত-ইংরেজি-বাংলা ভাষা গড়েপিটে দেবার কাজটি করেছিলেন বলে জানান সমরদার ভাই প্রবীর চক্রবর্তী, যিনি নিজেও একজন সংস্কৃতজ্ঞ। মেজো ভাই পীযূষ চক্রবর্তী চিত্রকলা এবং পরবর্তীকালে ফটোগ্রাফির বিশিষ্ট শিল্পী। আবৃত্তিতেও তিনি প্রথিতযশা। পারিবারিক এই উত্তরাধিকার এবং সাহচর্য সমরদাকে ক্রমবিকশিত এবং ক্রমপরিণত করেছে। সংস্কৃত জ্ঞান নিত্যনতুন বাংলা শব্দ নির্মাণ এবং অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারে তাকে সাবলীল করেছে। 'কনীয়ান' শব্দটি (দু'জনের মধ্যে ছোট অর্থে) তাঁর কাছেই প্রথম শোনা।

সমরদা ছিলেন শহরের সাংস্কৃতিক অভিভাবক। যে কোন সমস্যার সমাধান ছিল তাঁর কাছে। প্রত্যক্ষ কোন রাজনীতির সঙ্গে তিনি সেভাবে কোনদিনই যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যে কোন রাজনীতির মানুষের সঙ্গেই ছিল তাঁর সহৃদয় সম্পর্ক। অভিনব ধরনের মানপত্র রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, স্বাভাবিকভাবেই শহরের যেকোন গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন অসম্পূর্ণ থেকে যেত তাঁর ছোঁয়া ব্যতিরেকে। ছন্দজ্ঞান ছিল অ-সাধারণ। কবিতায় সংস্কৃত এবং বাংলা ছন্দকে এত বিচিত্রভাবে ব্যবহার করেছেন যে তা শিক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কোথাও কোন লেখা দেবার পর যতক্ষণ পর্যন্ত না যথাযথ ছাপা সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছেন, ততক্ষণ এক অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করত তাঁর মধ্যে। প্রুফ সংশোধনের জন্য হামেশাই পৌঁছে যেতেন প্রেস পর্যন্ত। একটি 'ড্যাশ' বা 'কমা' বা 'ঊর্ধ্বকমা'র স্থানচ্যুতিও তাঁকে পীড়িত করত।

সমরদার আকস্মিক চলে যাওয়া তাঁর পরিবার এবং ঘনিষ্ঠজনেদের কাছে তো বটেই, এই শহরের পক্ষেও এক বড় ক্ষতি। যে কোন সংশয় অনায়াস অপনোদনের সুযোগ ছিল শুধু এক টেলিফোন কলে কিংবা নিছক আড্ডায় — সে সুযোগ আমরা হারালাম। যখন ছিলেন তখনও কি আমরা যথাযথ গুরুত্বে দেখেছি তাঁর জীবন এবং কর্মকে? সরকারিস্তরে সমরদা স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেক পরে 'বঙ্গরত্ন' সম্মানের মাধ্যমে। শ্রী গৌতম দেব সরকারি স্তরে দায়িত্ব পাবার পর ছাত্রসুলভ বিনম্রতায় চেষ্টা করেছেন সমরদার প্রতিভার যথাযথ মর্যাদা প্রদানের। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের মানুষদের যে দায় এবং দায়িত্ব নেবার কথা ছিল তা কি সত্যিই নেওয়া গেল? 'পদ্য সম্পাদক রিমি দে'র সম্পাদনায় 'নির্বাচিত সমর চক্রবর্তী' প্রকাশের পরও অগোছালো সমরদার অনেক লেখাই তো থেকে গেল অগোছালো অবস্থাতেই, তাঁর অমূল্য বক্তৃতাগুলিও তো সংরক্ষিত হল না। আমার আর একজন মাস্টারমশাই অধ্যাপক সঞ্জীবন দত্ত রায় বলেন, 'সমর ঠাট্টা করেই জীবনটা কাটিয়ে গেল'। আমরাও কি সমরদাকে নিছক আমুদে, আড্ডাবাজ এবং মনোরঞ্জক একজন মানুষ হিসেবেই দেখে গেলাম? ■

চিত্ত চন্দ

খেলার ছলে খেলার শুরু

অমিত খাসনবিশ
প্রাক্তন ফুটবলার
শিলিগুড়ি

জন্মঃ০৫-১২-১৯৩৯.

মৃত্যুঃ১৩- ০১- ২০২০.

শিলিগুড়ি শহরের মানুষ যাকে সবাই প্রায় এক ডাকে চিনতেন তিনি ছিলেন সবার প্রিয় ফুটবলার চিত্ত চন্দ, অনেকেই তাকে ঘন্টুদা নামে চিনতেন। বাবা স্বর্গীয় জ্যোতিষ চন্দ্র চন্দ ও মা স্বর্গীয়া স্নেহলতা চন্দের পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ সন্তান। চিত্তবাবুর জন্ম ৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সালে অধুনা বাংলাদেশের বগুড়ায়, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা বর্ষে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে মাত্র ৮ বছর বয়সে বাবা- মা ও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে পদার্পণ এবং সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের পথ চলা। প্রথম দিকে বাবার অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও লুকিয়ে লুকিয়ে খেলার ছলে ফুটবলে পা ছোঁয়ানো শুরু। পরে অবশ্য পরিবারের সবার কাছ থেকেই উৎসাহ পেয়েছেন, ক্রমশ ফুটবল তাঁর জীবনের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। পরবর্তীকালে স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ সব জায়গায় নিজেকে ফুটবলার হিসেবে মেলে ধরতে সক্ষম হন, সেই সময় তিনি খেলতেন মূলত খালি পায়ে কখনো বা কেডস জুতো পায়ে। ফুটবলের পাশাপাশি লংজাম্প, হাইজাম্প এবং পোলভল্ট এই সব খেলা ছিল তাঁর পছন্দের তালিকায় এবং পরে এই খেলা গুলিতে তিনি সমান পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি তাঁর প্রথম বুট পায়ে ক্লাব ফুটবলে অংশগ্রহণ। সেই সময়ে শিলিগুড়ি ফুটবলের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দল ছিল দেশবন্ধু স্পোটিং ইউনিয়ন, বিবেকানন্দ ক্লাব ও শিলিগুড়ি জংশন অঞ্চলের এন এফ রেল দল। তিনি ছিলেন সুভাষ স্পোটিং ক্লাবের অন্যতম সদস্য ও একাধারে দলের অপরিহার্য খেলোয়াড়। যদিও বিভিন্ন নামী দল থেকে তাঁর কাছে অনেক প্রস্তাব আসে, এমনকি কলকাতার প্রথম বিভাগীয় দল উয়াড়ী এ্যাথলেটিক ক্লাবের হয়ে খেলার সুযোগ এলেও তিনি তাঁর প্রিয় দল

স্থানীয় সুভাষ স্পোটিং ক্লাবকে এতটাই ভালবাসতেন যে, সে ডাক অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করেন। রেলে চাকরির সুযোগ পেয়েও তিনি নির্দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত ওই দল ছেড়ে অন্য কোনো দলে যোগ দেওয়ার কথা তিনি চিন্তাই করেননি, বরং সুভাষ স্পোটিং ক্লাবের উন্নতির জন্য সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। দিনে দিনে তিনি হয়ে ওঠেন শিলিগুড়ি মহকুমা ও দার্জিলিং জেলা ফুটবল দলের অপরিহার্য খেলোয়াড়।

পরবর্তীকালে এক ব্যাক্তিগত সাক্ষাতে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, ১৯৬৭ সালে বালুরঘাট ময়দানে আয়োজিত আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় দার্জিলিং দল পৌঁছায় সেমিফাইনালে, তিনি ছিলেন দার্জিলিং জেলা দলের অধিনায়ক, খেলা ছিল দিনাজপুর জেলার বিরুদ্ধে, ম্যাচের আগে তাকে না জানিয়ে তৎকালীন কর্মকর্তারা নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড়দের নামানোর চেষ্টা করেন। এতে চিত্তবাবু তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সমস্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন,পরে অবশ্য উদ্যোক্তাদের অনুরোধে ভারাক্রান্ত মনে খেলায় অংশ নেন ঠিকই কিন্তু পরাজিত হয়ে ফিরতে হয়, সে বছরেই কর্মকর্তাদের অঙ্গুলি হেলনে প্রতিবাদী চিত্তবাবুকে মহকুমা দল থেকে বহিষ্কার করা হয়, অভিমানে তিনি জেলা দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন, তৎকালীন সেই সমস্ত কর্মকর্তাদের তিনি কখনো ক্ষমা করতে পারেননি।

চিত্তবাবু ছিলেন মূলত রক্ষণভাগের খেলোয়াড় কিন্তু দলের স্বার্থে তাকে আক্রমণ ভাগের নেতৃত্ব দিতেও দেখা গিয়েছে। তাঁর দুই পায়ে ছিল অসম্ভব জোরে শট করবার ক্ষমতা কিন্তু তিনি বিখ্যাত ছিলেন হেডের জন্য । এমনিতেই তিনি উচ্চতায় ছিলেন প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির মতো, তার ওপর অনায়াসে শরীরটাকে প্রায় তিন ফুট ওপরে তুলে তাঁর অসামান্য হেড করবার ক্ষমতায় দর্শকদের মুগ্ধ করতেন । বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের পক্ষে তার মাথার ওপর দিয়ে বল নিয়ে টপকানো ছিল কঠিন ব্যাপার। চিত্তবাবু বিভিন্ন খেলায় হেডে দুর্দান্ত সব গোল করে দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাঁর চেহারা দেখে একটু গুরুগম্ভীর মনে হলেও মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অমায়িক ভদ্রলোক। সেই সময় বিবেকানন্দ ক্লাবের বিপক্ষে লিগের একটি খেলায় বিপক্ষ দলের আর এক বিখ্যাত খেলোয়াড় তারাপদ মজুমদার ও চিত্তবাবু এক সঙ্গে বল লক্ষ্য করে হেড দিতে উঠলে চিত্তবাবুর কনুইয়ের গুঁতোয় তারাপদবাবুর নাক ফেটে যায়, খেলা শেষ হতেই চিত্তবাবু ছুটে যান তারাপদ মজুমদারের বাড়িতে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেবার জন্য এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন এক ভাবে খোঁজ নিতে তিনি ভুলতেন না ।

ষাট দশকের মাঝামাঝি ইন্টার সাব-ডিভিশনাল গভর্নরস কাপ ফুটবল ফাইনালে দার্জিলিং দলের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে তৎকালীন মহকুমা শাসক অজিত মুখার্জীকে দলের অধিনায়ক চিত্তবাবু কথা

দিয়েছিলেন দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়বেন এবং দল জেতে ৩-২ গোলের ব্যাবধানে, চিত্তবাবু দুটি গোল করেছিলেন। দ্বিতীয় গোলটি করার সময় তীব্র শটে জাল ছিঁড়ে ফেলার অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে ভীষণ তৃপ্তি দিত। সে কথা তিনি তাঁর অনেক সতীর্থদের কাছে গল্প করতেন। প্রায় একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন মালবাজারের ময়দানে আন্তঃ চা বাগান ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাংমারি চা বাগানের হয়ে ফাইনালে তাঁর করা দুটি অসাধারণ গোল করে স্থানীয় দর্শকদের অবাক করে দলকে জয় এনে দেওয়া প্রসঙ্গে।

শিলিগুড়ি ময়দানে চিত্তবাবুর সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রলয় মৈত্র, তারাপদ মজুমদার (তারা), সমীরবিন্দু ধর, গোপাল হোড়, অচিন্ত্য রায় চৌধুরী, অরুণ সরকার প্রমুখ ছিলেন শহরের নামী খেলোয়াড়। প্রায় দু-দশকের বেশি দাপটের সঙ্গে ময়দানে কাটিয়ে খেলা থেকে অবসর নিয়ে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গা থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে বিভিন্ন জায়গায় খেলবার ব্যাবস্থা করে দিতেন। আশির দশকে শিলিগুড়ি ভেটারেন অ্যাসোসিয়েশনের শুরু থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব নিখুঁতভাবে সামলেছেন। সেই সময় তার স্ত্রী আলপনাদেবী সবসময় ছায়াসঙ্গীর মতো পাশে থেকে সমস্ত বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের উন্নতির জন্য তিনি প্রায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। সেই নিয়ে বাড়িতে কোনো দিন অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়নি বরং সব সময় উৎসাহ পেতেন। ছেলে দেবোৎপলের অসময়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া ও তাঁর প্রিয় ক্লাবের করুণ পরিস্থিতির জন্য প্রতিদিন মানসিকভাবে আহত হয়েছেন।■

সাম্প্রতিক শিলিগুড়ির সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার নানা দিগন্ত

শিলিগুড়ির সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চা

■ কৌশিক জোয়ারদার

শিলিগুড়ির সাহিত্যচর্চা নিয়ে বলার যোগ্য লেখক আমি নই। জন্মসূত্রে নয়, কর্মসূত্রে আমি এই শহরের বাসিন্দা। অবশ্য ভাসমান জীবনে সবচেয়ে বেশিদিন আমি এই শহরেই রয়েছি, একটানা। আমার দিক থেকে বলতে গেলে, আমি তো এখন এই শহরেরই। কিন্তু একটা কুণ্ঠা ও শঙ্কা থাকেই মনের ভিতরে, এই শহর কি আমাকে তার নিজের ভাবে? বারবারই আমার এই দুর্ভাবনাকে অমূলক প্রমাণ করেছে শিলিগুড়ি। বিশেষ ক'রে তার সাহিত্যজগৎ। আমি যত এগিয়েছি, তার চেয়ে বেশি কাছে এসে আলিঙ্গন করেছে সে আমায়। এই শহরের সাহিত্য পত্রিকা 'শিলিগুড়ি জংশন' উত্তরের কবিদের জেলাভিত্তিক সংকলন প্রকাশ করেছিল যখন, আমার কবিতা শিলিগুড়ি-সংকলনে ঠাঁই পেয়েছিলো। কথাটা বললুম তার কারণ আছে। এটা এই শহরের বৈশিষ্ট্য। তুলনায় দেখবেন, শিলিগুড়ি অনেক উদার ও গ্রহণশীল। নানান অঞ্চলের নানা ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষকে শিলিগুড়ি শীঘ্রই নিজের করে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে। সহাবস্থান এখানকার রাজনীতিকেও আলাদা ক'রে চিহ্নিত করে। সাহিত্যক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। এই শহরের সাহিত্য নিয়ে আমাকেই লিখতে বলে সম্পাদক সেই কথাই আবার প্রমাণ করলেন। যদিও আমি কেন, কারোর পক্ষেই একটি জেলা তথা শহরের সাহিত্যচর্চার সমস্ত খবর রাখা সম্ভব নয়, অথবা অনুল্লেখের অপরাধ যে-কারোর পক্ষেই ক'রে ফেলা সম্ভব। আমি বরং লেখকতালিকার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশের চেষ্টা করবো।

সাহিত্য ও শিল্পের নানান ক্ষেত্রে ধারাবাহিক চর্চার ক্ষেত্রে এই শহরের ঐতিহ্য নেই ; এমনটাই মনে করেন অন্য শহর ও জেলার সাহিত্যসমাজ। মজার কথা হলো, এই শহরের সৃজনকর্মীরাও কথাটা মেনে থাকেন। এই শহর বাণিজ্যের, ভ্রমণপিপাসুর বন্দর। কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির নয়। আমিও এই শহরে পা দিয়ে নাগরিকদের মুখে এই কথাটার আবৃত্তি শুনেছি। অথচ এই শহরে বিমলেন্দু দাম, হরেন ঘোষের মতো বরেণ্য সাহিত্যিক ও সংগঠক ছিলেন, অশ্রুকুমার শিকদারের মতো অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক, লেখক চোমং লামা (বিমল ঘোষ) এই শহরেই বাস করতেন, বীরেন চন্দের সম্পাদিত 'উত্তরধ্বনি' পত্রিকার বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে...আরো কতো উদাহরণ! কিন্তু বাণিজ্য শহর হিসেবে উত্তরের অন্য সব শহরের থেকে এগিয়ে থাকার কারণেই তার সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলনায় গৌণ মনে হয়। কিন্তু আর সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারছে না। এই শহরের সাহিত্যচর্চাকে খেয়াল না-করার উপায় আর নেই।

এই সময়ের লেখালিখি বলতে আমি কেবল তরুণদের সাহিত্যের কথা বুঝি না। একজন লেখক তাঁর

সম্পূর্ণ জীবনজুড়েই সমসাময়িক। এমনকি প্রয়াত কবি সমর চক্রবর্তীও তাঁর লেখা ও গল্পে আজও প্রবলভাবে সমসাময়িক হয়ে আছেন। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিপুল দাসের বহুপ্রজ সক্রিয় কলম শিলিগুড়ির অন্যতম পরিচয়। দ্বিতীয় আরেকটি কথা, একটি জেলার বিচ্ছিন্ন দু'একজনের লেখা বাণিজ্যিকভাবে সফল পত্রিকায় ছাপা বা তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কারের উপর ভিত্তি ক'রে জেলার সাহিত্যচর্চার বিচার হয় না। ব্যক্তিগত সাফল্য হিসেবে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই প্রশংসার যোগ্য, জেলার মানুষ তাই নিয়ে গর্বও করবেন। কিন্তু জেলার সাহিত্যচর্চা গড়ে ওঠে মূলত লিটল্ ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করেই। এবং তারই সঙ্গে সাহিত্যবাসরগুলির ভূমিকাও কম নয়। 'উত্তরধ্বনি' পত্রিকা, যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, পঁয়তাল্লিশ বছরে পড়েছে। এই পত্রিকা এবং তার সম্পাদক শ্রী বীরেন চন্দ সাহিত্যিক হিসেবে এখনো সক্রিয়। দুই বাংলার কথা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তাঁর মূল্যবান লেখা আমরা পড়েছি। শিলিগুড়ির সাহিত্যচর্চার একটি ইতিহাস তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে আসুক, আমাদের প্রত্যাশা। তাঁর চেয়ে যোগ্য লোক আর কে আছেন এ বিষয়ে? শ্রী হরেন ঘোষ একাধিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন একটা সময়ে, সেগুলির ধারা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর অন্যতম কন্যা সেবন্তী এই শহরেই বেড়ে উঠে বাংলাভাষার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কবি, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক হয়ে উঠেছেন। আটাশ বছর পেরিয়ে 'মল্লার' পত্রিকার এখনো প্রবল উপস্থিতি। 'মল্লার' বাংলা আকাদেমিসহ একাধিক পুরস্কার পেয়েছে, এবং দুই বাংলায় খুবই পরিচিত একটি পত্রিকা। মল্লার এবং তার সম্পাদক গল্পকার শুভময় সরকারকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্যচর্চার একটি ধারা অনেক নতুন লেখকের উঠে আসাকে ত্বরান্বিত করেছে। এই পত্রিকার সাথেই যুক্ত অধ্যাপক সুতপা সাহা অনুবাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছেন। রিমি দে সম্পাদিত 'পদ্য' পত্রিকার বয়সও প্রায় আড়াই দশক হলো। পত্রিকাটি মূলত কবিতাবিষয়ক, কিন্তু বিশেষ সংখ্যাগুলি বিষয়-বৈচিত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেকের। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত মানসী কবিরাজ একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি। কবি শ্যামলী সেনগুপ্ত অনুবাদের মাধ্যমে ওড়িয়া ও বাংলাভাষার সেতু হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন নিরলস। গৌতম চক্রবর্তী সম্পাদিত 'গদ্যেপদ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে' পত্রিকাটির বয়সও প্রায় আঠারো। শিশির রায়নাথ, মৈনাক ভট্টাচার্য, অভিজিৎ মজুমদার প্রমুখ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। 'সৃজন সেনা'-র পার্থপ্রতিম মিত্র নাট্যচর্চার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চার একটি ধারাও বাঁচিয়ে রেখেছেন। 'উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ' পত্রিকা এবং তার সম্পাদক বিপদ ভঞ্জন সরকার এই শহরের নাট্যসাহিত্যের ধারাকে পুষ্ট করেছেন। তরুণদের দ্বারা পরিচালিত 'উত্তরের কবিমন' এবং 'শিলিগুড়ি জংশন' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি সাহিত্য পত্রিকা। উত্তরের কবিমনের সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ এবং শুভ্রদীপ রায় সম্ভাবনাময় দুই কবি। শুভ্রদীপের কবিতায় তার নিজস্ব স্বর অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। এই পত্রিকার সঙ্গেই যুক্ত কবি সন্দীপন দত্তের কথা অনেকেই আলাদা করে উলেখ

করছেন। অনন্যা দাশগুপ্ত, তপোব্রত সান্যাল, সৌরভী রায়, রতন দাস প্রমুখ তরুণেরা কবিমন ঘিরে নিজেদের লেখালিখির চর্চা করে যাচ্ছে। শিলিগুড়ি জংশনের সম্পাদক সুমন মল্লিক এবং সুভানকে আর সম্ভাবনাময় কবি বলা যায় না, তারা ইতোমধ্যেই পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য বাঁক বদল ও নতুন ভাষাসৃষ্টির সম্ভাবনা প্রতিটি শিল্পীর মধ্যেই আজীবন থেকে যায়। সুমন ও সুভান পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই যুক্ত, যদিও এই পত্রিকাটি বয়সে নবীন। উভয়ের হাত ধরে বাপ্পাদিত্য, রাজ, অঙ্কুর, সনজিৎ, প্রতীক, ত্রিয়াশা, বেদশ্রুতি, বিজয় বর্মন, মৈত্রেয়ী, প্রমুখ একঝাঁক তরুণ দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছেন এই শহরের সাহিত্যের মানচিত্রে। রাজা প্রকাশিত 'প্রাসঙ্গিক' ইদানিং দৃশ্যমান না হলেও তার নিজের কাব্যচর্চার ধারা অব্যাহত। কাব্য ও প্রবন্ধের চর্চায় রীতিকা, তিতীর্ষা, সীমন্তিনীর মতো নতুনদের উঠে আসাও আশার কথা।

যেসব তরুণদের উল্লেখটুকুই করতে পারলাম লেখায়, তারা অধিংকাংশই কবি। তুলনায় গল্পকারের সংখ্যা কম, এবং প্রাবন্ধিক তো আরোই বিরল। গল্পকারদের মধ্যে দেবাশিস চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র সাহা, কমল আচার্য সুদীপ চৌধুরীর মতো অগ্রজের পাশাপাশি নতুন গল্পকার উঠে আসছেন কম। সুকান্ত নাহা অনেকদিন লিখছেন, চা-বাগানের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট তাঁর গল্পে পাঠকেরা ভিন্ন স্বাদ উপভোগ করেন। বস্তুত পাহাড় ও ডুয়ার্সের প্রকৃতি ও কৃষিজ বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের অনেক লেখককেই স্বতন্ত্র করে তুলেছে। গল্পকার হিসেবে রম্যাণি গোস্বামী খুব অল্প সময়ে পরিচিতি তৈরি করে ফেলেছেন। অন্যদিকে সঞ্জীবন দত্তরায়, সৌমেন নাগ, শিশির রায়নাথ, অভিজিৎ মজুমদার, তাপস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ লেখকেরাই এই শহরের প্রবন্ধচর্চার ধারাটি বাঁচিয়ে রেখেছেন। শিশির রায়নাথ কবিতায় ফিরে এসেছেন, এটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সুখবর। আর নাম করতে হয় ভ্রমণসাহিত্যের একচ্ছত্র অধিপতি প্রবীণ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের কথা। রসিক এই মানুষটির উপস্থিতি যে-কোনো সাহিত্যবাসরে প্রাণ-সঞ্চার করে। ভবানী সরকারের মতো সর্বভুক পাঠক ও বিদগ্ধ চিন্তক-প্রাবন্ধিকের প্রয়াণ এই শহরের প্রবন্ধচর্চার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তরুণ লেখকদের অনাগ্রহ ভাববার বিষয়। একটি রচনার পেছনে প্রাবন্ধিকেরা যে সময় ও শ্রম ব্যয় করেন, তার মূল্য অবশ্য কোনোকালেই তাঁরা পান না। জনৈক গল্পকার বলছিলেন সেদিন, সম্পাদকেরা পাতা ভরানোর জন্যেই প্রাবন্ধিকের শরণাপন্ন হন। সংকলন-গ্রন্থ বেরোলে তবু কিছু পাঠক পাওয়া যায়।

শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই শহরের জাতি ও ভাষাবৈচিত্র্য, যা অন্য অনেক শহরেই অনুপস্থিত। ফলে, এই শহরের সাহিত্যচর্চা কেবল বাংলাভাষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। বাংলা ছাড়াও রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চা ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠছে এই শহরে। অধ্যাপক নিখিলেশ রায় বাংলাভাষার একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি, একই সঙ্গে তিনি রাজবংশী ভাষারও অন্যতম প্রধান কবি ও প্রাবন্ধিক। 'অন্যকাগজ'

নামে বাংলায় একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁরই হাত ধরে শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে শিবমন্দিরে গড়ে উঠেছে 'রাজবংশী সাহিত্য আকাদেমি'। নিখিলেশের সম্পাদনায় রাজবংশী ভাষার কাগজ 'ডেগর' অনেক তরুণ লেখকের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি তরুণ অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায়ের সম্পাদনায় বাংলা-রাজবংশী দ্বিভাষিক 'পুলি' পত্রিকাটি দুটি ভাষার সংস্কৃতির সংযোগ ও সমন্বয়ে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। নেপালি ভাষার লেখকদের মধ্যে রাজা পুনিয়ানী ও পার্বতী দেওয়ান উল্লেখযোগ্য। 'টুইন্স ক্যাফে' সহ বেশ কিছু আড্ডাস্থান বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের আদান-প্রদানের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। মহাবীর চাচান ও ভিকি প্রসাদ হিন্দি ভাষার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক। নক্সালবাড়ি এলাকায় শ্রী গর্জন মল্লিক বিপন্ন ধিমাল ভাষায় সাহিত্যচর্চা ক'রে চলেছেন। এমনকি এই ভাষায় গীতাঞ্জলি ও রামায়ণ মহাকাব্যের অনুবাদের কাজও শুরু করেছিলেন তিনি।

ব্যক্তিগত সাহিত্যচর্চা ও ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা ছাড়াও সাহিত্যের প্রসারে আরও একটি ব্যাপারের উল্লেখ করতে ইচ্ছে করছে। উল্লিখিত পত্রিকাগোষ্ঠীগুলো পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও নিয়মিত সাহিত্যবাসরের আয়োজন ক'রে থাকে। এব্যাপারে মল্লার পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠানে কৃতী সাহিত্যসেবীদের পুরস্কার প্রদান ছাড়াও শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। পদ্য পত্রিকার সম্পাদক রিমি দের বাড়িতেই 'আড্ডাগলি' নামক একটি আড্ডঘরে কবিবাসর, চলচ্চিত্র-আলোচনাসহ নানান অনুষ্ঠানে লেখকশিল্পীদের দেখা হয় নিয়মিত। শিলিগুড়ি জংশন ও উত্তরের কবিমন পত্রিকার অনুষ্ঠানগুলিতে তরুণ কবিসাহিত্যিক ও সঙ্গীতশিল্পীদের উপচে পড়া উপস্থিতি চোখের আরাম। সাহিত্যানুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে অন্য দুয়েকটি প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে এসেছে এই শহরে। 'ইচ্ছেবাড়ি' নামক বুটিক-ক্যাফে বেশ কয়েকবছর তাদের সুদৃশ্য সভাঘরে সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এই বিষয়ে পথিকৃৎ অবশ্যই 'মৌতাত' নামক টি-ক্যাফে। বর্তমানে কিশোর সাহা পরিচালিত 'চণ্ডাল' নামক পুস্তক-বিপণী গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান সহ শিল্পী-সাহিত্যিকদের মিলনানুষ্ঠানের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানগুলির কারণে বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরকে উত্তরের সবচেয়ে সক্রিয় শহর হিসেবে প্রতিভাত করে। চলচ্চিত্র ও নাটক ছাড়া শিল্পসৃষ্টি দলবদ্ধভাবে করা যায় না ঠিকই, কিন্তু শিল্পীদের পারস্পরিক মতবিনিময় নিজেদের মূল্যায়নের সহায়ক। তাছাড়া লেখকেরা কবিতা বা গল্প পাঠকদের সামনে সরাসরি রাখতে চাইলে এই অনুষ্ঠানগুলির বিকল্প নেই। এইজন্যেই সাহিত্যচর্চার আলোচনায় শিলিগুড়ির এই নতুন দিকটির উল্লেখ করলাম।

অতিমারির সময়ে অন-লাইন অনুষ্ঠান সাহিত্যচর্চার অপর একটি বিকল্প তুলে ধরে। ফেসবুকে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা, কবিতাপাঠ ও অন্যান্য দৃশ্য অনুষ্ঠানের আয়োজনে সামগ্রিকভাবেই উত্তরবঙ্গের নারীদের

উদ্যোগ বেশি করে চোখে পড়ে। শিলিগুড়িও ব্যতিক্রম নয়। তবে লিখিত আকারে ফেসবুক সিরিজে গল্প কবিতা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে শিলিগুড়ির মল্লার পত্রিকা অগ্রণী ভুমিকা নিয়েছিলো। মুক্তগদ্যের চর্চায় 'প্রাসঙ্গিক' পত্রিকার নামও উল্লেখ করতে হয়।

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বাচিক শিল্পীদের অবদান নিয়ে অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু আমি তাঁদের ভূমিকা উল্লেখ না-ক'রে পারি না। সুবীর ভট্টাচার্য এই শহর তথা বাংলার একজন তারকা বাচিক-শিল্পী। গত দুছরে তাঁর চেষ্টায় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ শ্রুতি-সাহিত্য চর্চায় শিলিগুড়ি নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়া চিকিৎসক কবি ও বাচিক শিল্পী পার্থ প্রতিম পান, জুঁই ভট্টাচার্য, অতসী রায় ও সুমিতা দত্তের বিভিন্ন প্রচেষ্টাগুলির নাম করতেই হয়। একটি টিভি চ্যানেলে সুমিতা প্রোডাকশনসের 'অভিনয়, কবিতা এবং সুমিতা' শীর্ষক অনুষ্ঠান উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের কবি শিল্পী ও নাট্যকারদের দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শিল্পীরাও পরস্পরের কাজের একটা ধারণা পেয়েছিলেন ধারাবাহিক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আমি মনে করি একটি শহরের সাহিত্যচর্চার প্রসারে এই সব ধরণের প্রচেষ্টাগুলোরই একটা মূল্য আছে।

আজ উত্তরবঙ্গে তথা পশ্চিমবঙ্গেই শিলিগুড়ির পরিচয় কেবল বাণিজ্য শহর হিসেবে নয়। ইংরিজিতে যাকে বলে 'হ্যাপেনিং', সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিলিগুড়িকে তেমনই শহর বলে বলতে শুনেছি ভিন্-শহরের অনেককে। ভিন্ন প্রজন্মের সাহিত্যের মানুষেরা একসঙ্গে মিশে গিয়ে কাজ করছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সাহিত্য সৃষ্টির কাজটা একাই করতে হয়, কিন্তু পরিবেশ গড়ে তুলতে গেলে দরকার সমবেত প্রয়াস।■

সাম্প্রতিক সময়ে শিলিগুড়ির থিয়েটার

■ পার্থপ্রতিম মিত্র

'সাম্প্রতিক' শব্দটি আপেক্ষিক। সময়ের নিরিখে শব্দটির বিস্তার কতটা? বঙ্গ রঙ্গমঞ্চর পটভূমিতে 'সাম্প্রতিক সময়ে শিলিগুড়ির থিয়েটার' শিরোনামে কী ব্যঞ্জনা উপস্থাপিত হয়? আদৌ হয় কি? এখানে 'সাম্প্রতিক সময়' বলতে কি স্মৃতিধার্য সময়? সাম্প্রতিক কালপর্বের এখানে সূচক কী ধরা হবে? বঙ্গ রঙ্গমঞ্চর পূর্বাপর ইতিহাসের সঙ্গে কি শিলিগুড়ির থিয়েটারের ইতিহাস আদৌ জারিত? বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর ব্রিটিশ রাজপুরুষের চোখ রাঙানো নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের টানা-পোড়েনের সময়পর্ব পেরিয়ে, গিরিশযুগ পার করে, শিশিরযুগের প্রায় সূত্রপাতের সময় মিত্র সম্মিলনীর 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে এই ভূমির নাট্যচর্চার সূত্রপাত। সেই সাত সকালের নাট্যচর্চায় পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নাট্য প্রযোজনায় মঞ্চম্যাজিক মদিরার টইটম্বুর দিনগুলিতে, শিলিগুড়ির নাট্যচর্চা কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্টই অর্জন করে নি, বরঞ্চ টলোমলো পায়ে হাঁটতে শিখছে মাত্র। এমনকি 'নবান্ন' তথা গণনাট্য পর্বে এসেও মিত্র সম্মিলনী'র প্রযোজনায় নারী চরিত্রে রূপদান করছে পুরুষেরা। আরো পরে মিত্রসম্মিলনীর 'কালিন্দী' প্রযোজনায় অনেক সংস্কারের বেড়াজাল পেরিয়ে, বলা যেতে পারে প্রায় বিপ্লব করেই পাঁচ মঞ্চদুহিতার আত্মপ্রকাশ। পাঁচের দশকে এসে 'কথা ও কলম' শহরের প্রথম গ্রুপ থিয়েটার বলে স্বীকৃত। ছয়ের দশকে এসে রাজনৈতিক প্রবাহ স্রোতে শিলিগুড়ির রঙ্গমঞ্চ বার্তা দিচ্ছে। সাবালক হচ্ছে থিয়েটার। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঈশাণ কোণে ঝড় ওঠে। সেই ঝোড়ো হাওয়ায় একটা প্রজন্মর কেউ গিয়েছে লাশকাটা ঘরে, কেউ থানা গরাদে, কেউ লিটিল্ ম্যাগাজিন দপ্তরে, কেউ গ্রুপ থিয়েটারে। শহরে মাথা তুলছে একের পর এক গ্রুপ থিয়েটার — 'কল্লোল','মিলেমিশে', 'রঙ্গন', 'দামামা'। বলাই বাহুল্য সেই সময় 'সাম্প্রতিক' নয় 'অতীত'। কিন্তু 'দামামা'-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পার্থ চৌধুরী আজ সত্তর বছরের তরতাজা তরুণ হয়ে 'দামামা'-র পঞ্চাশ বছর পূর্তির স্বর্ণালী মুহূর্তে যখন শহর জুড়ে ছোটাছুটি করছেন, সেটাকেই আমরা ধরে নিতে পারি শহরের নাট্য-র সাম্প্রতিক চালচিত্র। এই শহরের নাট্য পরিক্রমার একটা গর্ব করার মত পথফলক! উত্তরের বালুরঘাট-এর 'ত্রিতীর্থ'-র পর 'দামামা' একমাত্র দল যারা পৃথিবীকে পঞ্চাশবার প্রদক্ষিণের সঙ্গতে জারি রেখেছে তাদের অবিচ্ছিন্ন নাট্য নিমগ্নতা।

সাতের দশকে 'দামামা'র প্রয়োগপ্রধান অমল চক্রবর্তী একটি জনপদকে নাট্যচর্চায় আধুনিক করে তুলেছেন। 'তাজমহল', 'প্রতিশ্রুত অভিমন্যু', 'শতাব্দীর পাড়ে', 'আমার নাম ৪৫' প্রভৃতি প্রযোজনার খণ্ড দৃশ্য সাম্প্রতিক সময়ের সুবর্ণশোভিত প্রহরে যদি পুনঃপ্রয়োজিত হ'ত তাহলে আজকের নাট্য নিমগ্ন প্রজন্ম

(সংখ্যায় যত সংখ্যালঘুই হোক না কেন) মঞ্চ ইতিহাস চেতনায় জারিত হতে পারত, যা সাম্প্রতিক সময়ের জন্য সত্যিই জরুরি ছিল। 'দামামা'র সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের অঙ্গরূপে গত ২ থেকে ৪ এপ্রিল ২০২৩ দীনবন্ধু মঞ্চে অংশগ্রহণকারী নাট্যদলেরা সকলেই এই শহরে অন্তত পঁচিশ বছর অতিক্রম করেছে বা পঁচিশ বছর অতিক্রমণের মুখে। এই উৎসবেও অমল চক্রবর্তীর 'পেশকারের বিচার' প্রযোজনা করেছে বলাকা এবং কুন্তল ঘোষের লেখা 'অমল আলোয়' মৌলিক নাটকে (উত্তাল প্রযোজনা) এই ভূমির নাট্যব্যক্তিত্ব অমল চক্রবর্তীর দীপ্তি বিচ্ছুরণকে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছি আমরা। এই উৎসবের অপরাপর প্রযোজনাগুলি হল থিয়েটার একাডেমি'র 'যদি তেমন হতো' (নাটক-নির্দেশনা ঃ কুন্তল ঘোষ), ঋত্বিক-এর 'পাখি' (নাটক ঃ মনোজ মিত্র, নির্দেশনা ঃ প্রসেনজিৎ সেন), সৃজনসেনা'র 'ইতি ক্যাপ্টেন অনীক (নাটক-নির্দেশনা ঃ পার্থপ্রতিম মিত্র), উত্তাল-এর 'অমল আলোয়' (নাটক ঃ কুন্তল ঘোষ, নির্দেশনা ঃ পলক চক্রবর্তী), ইঙ্গিত-এর 'সওদাগর' (নাটক - সৌমিত্র চ্যাটার্জী, নির্দেশনা ঃ আনন্দ ভট্টাচার্য)। নিরবচ্ছিন্নভাবে দশকের পর দশক পেরিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে এরা প্রযোজনামগ্ন। এইসব সংস্থার আগে-পরে একইসঙ্গে জন্ম নেওয়া অনেক পড়শি সংস্থা সময়ের গর্ভে লীন হয়ে গিয়েছে। এইসব সংস্থা তাদের প্রাণস্পন্দনে সজীব অস্তিত্বই রেখেছে শুধু না, সময়ের কাছে, প্রজন্মের কাছে আর্তি জানাচ্ছে — 'মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ'। এক্ষেত্রে ঋত্বিক সংস্থার প্রসেনজিৎ সেন নবীন পরিচালকরূপে অবশ্যই সময়ের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখবে। যদিও নাট্য সংস্থার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে থমকে যাওয়ার পশ্চাতে আর্থসামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক কার্যকারণও রয়ে যায়। আমরা কোভিডধ্বস্ত পৃথিবীকে এক জলবিভাজিকা রেখা ধরে নিয়ে তার আগে ও পরে সংস্থাগুলির প্রযোজনার নিরিখে সজীবতা পরখ করে নিতে পারি।

বলাকা প্রযোজনা 'ফোর আওয়ার্স' (২০১৭, নাটক - মৈনাক সেনগুপ্ত, নির্দেশনা -কল্যাণ দাশগুপ্ত), বৃন্তচ্যুত (২০১৮, নাটক - মৈনাক সেনগুপ্ত, নির্দেশনা - কল্যাণ দাশগুপ্ত), 'যদি জানতেম' (২০১৯, নাটক - শিবংকর চক্রবর্তী, নির্দেশনা - কল্যাণ দাশগুপ্ত), পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা 'চন্দ্রবিন্দু ও পাথরবাটি' (নাটক - গৌতম রায়, নির্দেশনা - কল্যাণ দাশগুপ্ত)। কোভিড উত্তর সময়ে পরিবর্তন (২০২৩, নাটক - বাণীব্রত রাজগুরু, নির্দেশক - বিমান দাশগুপ্ত) এবং পেশকারের বিচার (নাটক - অমল চক্রবর্তী, নির্দেশনা - কল্যাণ দাশগুপ্ত)।

প্রাক্‌কোভিড সময়ে ইঙ্গিত নাট্য সংস্থার প্রযোজনা 'আলোর ঠিকানা' (নাটক ঃ বিপ্লব শঙ্কর মজুমদার এবং নির্দেশনা - আনন্দ ভট্টাচার্য)। গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ ইংগীত প্রযোজনা করে 'সন্ধ্যাবেলা' (নাটক - কুন্তল ঘোষ, নির্দেশনা - আনন্দ ভট্টাচার্য) এবং 'সওদাগর' (নাটক ঃ সৌমিত্র চ্যাটার্জী, নির্দেশনা - আনন্দ ভট্টাচার্য)। মুক্তমঞ্চে তাঁদের প্রযোজনা 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব' (নাটক - পার্থপ্রতিম মিত্র, নির্দেশনা - আনন্দ

ভট্টাচার্য)।

উত্তাল প্রযোজিত একাঙ্ক 'এক সন্ধ্যায়' (নাটক- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নির্দেশনা - পলক চক্রবর্তী), 'গিরগিটি' (চেখভের গল্প অবলম্বনে নাটক - সফদার হাসমি, নির্দেশনা - পলক চক্রবর্তী), পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা 'অগ্নিশুদ্ধি' (নাটক - হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, নির্দেশনা - পলক চক্রবর্তী)।

লক্‌ডাউনের পর্বে প্রযোজিত নাটক 'জ্ঞান' (নাটক ও নির্দেশনা ঃ সায়ন্তন পাল), 'হারানো পদক' (নাটক - সুভান, নির্দেশনা- সায়ন্তন পাল, রিনিক্তা দাশগুপ্ত), 'একুশে' (নাটক ও নির্দেশনা - কাঞ্চনময় ভট্টাচার্য), কলো ব্যাগ (নাটক ঃ মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা - পলক চক্রবর্তী)। কোভিড পরবর্তী সময়ে প্রযোজিত নাটক 'ষোল পাতা' (নাটক - মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা - সায়ন্তন পাল)।

প্রাক্‌কোভিড ঋত্বিক প্রযোজনা 'ইঁদুর দৌঁড়' (নাটক - অমল রায় এবং নির্দেশনা - শুভঙ্কর গোস্বামী) এবং পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা 'অন্তরিত' (নাটক - প্রণব কুমার ভট্টাচার্য, নির্দেশনা - কুশল বোস)। কোভিড পরবর্তী সময়ে 'একজন লক্ষীন্দর' (নাটক - মান্নান হীরা, নির্দেশনা ঃ কুশল বোস) এবং 'হক্কের ধন' (নাটক - শিবশঙ্কর দাস, নির্দেশনা -কুশল বোস)।

কোভিড পর্বের আগে দামামা প্রযোজনা 'আখরি ইনাম' (মূল রচনা - প্রেমচন্দ, নাট্যরূপ ও নির্দেশনা - পার্থ চৌধুরী) এবং কোভিড পরবর্তী সময়ে প্রযোজিত ছোট নাটক 'অন্ধকারের আলো' এবং 'এমন অন্ধকার' (নাটক ও নির্দেশনা - পার্থ চৌধুরী)।

কোভিডের পর থটস এরিণাকে দেখা গিয়েছে 'কোথায় যাব '(নাটক - মনোজ মিত্র, নির্দেশনা - ডঃ শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য) প্রযোজনা করতে। কোভিডের আগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, উত্তিরধ্বনি শাখা প্রযোজনা করে 'হয় বদন' (নাটক - গিরীশ কারনাড, নির্দেশনা - অমিতাভ কাঞ্জিলাল)।

প্রাক্ কোভিড সৃজনসেনা প্রযোজনা 'অমৃত সমান' (নাটক ও প্রয়োগ - পার্থপ্রতিম মিত্র) 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' (নাটক ও প্রয়োগ - পার্থ প্রতিম মিত্র)। কোভিড পর্বে প্রযোজিত নাটক 'টুইঙ্কল টুইঙ্কল' (নাটক-প্রয়োগ - রমেন রায়), 'অন্ত্যজ ভারত কথা' (নাটক-প্রয়োগ ঃ পার্থপ্রতিম মিত্র), 'লাভ ল্যান্ড' (নাটক-প্রয়োগ ঃ পার্থ প্রতিম মিত্র), হোম ডেলিভারি থিয়েটার শিরোনাম আঙ্গিকে নাটক 'এক অন্য পরীর গল্প' (নাটক-প্রযোগ ঃ পার্থ প্রতিম মিত্র)। সৃজনসেনা - র প্রযোজনা 'বায়োস্কোপ' 'স্বপ্ন বুড়োর গল্প', 'কাহানী এক বাঞ্জারি কী' এবং 'ইতি ক্যাপ্টেন অনীক'। (নাটক ও নির্দেশনা পার্থ প্রতিম মিত্র)।

নিয়মিত নাট্য প্রযোজনা করে শিলিগুড়ি থিয়েটার এ্যাকাডেমি। কোভিডের আগের প্রযোজনা 'নীরব সাক্ষী', 'এসো সকাল', 'চন্দ্রবদন', 'এক আহাম্মকের গল্প' (নাটক ও নির্দেশনা — কুন্তল ঘোষ)। কোভিডের

পরের প্রযোজনা 'পথ কত দূর', 'কুরুক্ষেত্র', 'যে দিন আসছে', 'দূরের স্বজন', 'যদি তেমন হতো' (নাটক ও নির্দেশনা — কুন্তল ঘোষ)। তবে ২০১৮তে পূর্ণাঙ্গ নাটক 'প্রাচীর' প্রযোজনার পর আর কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা করে উঠতে পারে নি।

শিশুদের নিয়ে নিয়মিত নাট্য প্রযোজনা করে শিশু নাট্যম। কোভিডের আগে শিশু নাট্যম প্রযোজনা 'রূপকথার ফানুষ' এবং 'আগডুম বাগডুম'। কোভিডের পরে এখনকার প্রযোজনা 'চকা ফকার কেরামতি'। নাটক ও নির্দেশনা, দীপোজ্জ্বল চৌধুরী।

শিলিগুড়ির প্রাচীনতম সংস্থা মিত্র সম্মিলনীর লক ডাউনের পর আন্তরিক নির্মাণ ছোট নাটক 'রাক্ষস' (নাটক - মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা - সুদীপ রাহা) এবং সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা 'উত্তরাধিকার' (নাটক ও নির্দেশনা — পার্থপ্রতিম মিত্র।)

শিলিগুড়ির কল্লোল নাট্য সংস্থার পুনরুজ্জীবনে প্রণব হোড় রায়ের সক্রিয়তার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। প্রণব হোড় রায় এর পরিচালনায় শ্যামাকান্ত দাসের 'গুলসন' একটি ভালো প্রযোজনা।

এই পটভূমিতে দেখা যেতে পারে পাণ্ডুলিপি ভিত্তিক নাট্য প্রযোজনার বৈশিষ্ট অর্জন করছে শহর শিলিগুড়ি। শহরের প্রতিশ্রুত তরুণ কবি, কলমের মানুষ এগিয়ে আসছেন নাট্য সৃজনে। নাটক লিখছেন শহরের প্রবীণ ও তরুণ নাট্যকর্মীরাও। প্রসেনজিৎ, সায়ন্তন, রিনিক্তা, শুভমরা আগামী প্রজন্মর প্রতিনিধি হয়ে এগিয়ে আসছে সপ্রাণ, যা শহরের থিয়েটারের মানুষদের থিয়েটারের আগামী নিয়ে স্বপ্নসাহসী করে তুলছে। তাদের নির্মাণ আন্তরিক, বিষয় বৈচিত্র আকর্ষণীয়।

শিলিগুড়ির থিয়েটারের একসময় উপজীব্য ছিল রাজনৈতিক উপাদান, যা শৈল্পিক শর্তকে পূরণ করে থিয়েটারীয় দ্বান্দ্বিকতাকে উপভোগ্য করে তুলত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক সমস্যা আর সামাজিক সংঘাতই বিষয় রূপে মুখ্য হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় প্রণব কুমার ভট্টাচার্যের 'অন্তরিত' প্রযোজনাটির কথা। এল জি বি টি সমস্যাই এই থিয়েটারের বিষয় বিন্যাসে। তবে রাজনৈতিক থিয়েটারের ক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় সৃজনসেনার 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' প্রযোজনাটির কথা। কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা অবলোপনের প্রতিবাদে একমাসের মধ্যেই এই প্রযোজনাটির নির্মাণ।

শিলিগুড়ির থিয়েটার চর্চা স্রোতস্বিনী বহতা নদীর মতই। এ নদীতে দুকূল ছাপিয়ে জোয়ার আসে। পলি পরে। শুরু হয় আগামীর চাষবাস। নতুন নতুন নাট্য সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় প্যাসনেট পারফরমার্স এর কথা। ২০১৭ তে অমিতাভ কাঞ্জিলালের রচনা ও নির্দেশনায় কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে নাটক 'ফয়জল' এক সাহসী প্রযোজনা। ২০১৯ সালে প্রযোজিত হয় 'তুঘলক' (নাটক ঃ গিরীশ কারনাড,

নির্দেশনা ঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল)। শিলিগুড়ির মাটিতে এইরকম বর্ণাঢ্য প্রযোজনা অবশ্যই এক বড় প্রাপ্তি। এছাড়া প্রযোজিত হয় মোহন মহর্ষির 'রাজা কি রসুই' আশ্রয়ে 'রাজভোগ' (নাটক ও নির্দেশনা - অমিতাভ কাঞ্জিলাল)। ২০১৮ - ১৯ এর প্রযোজিত ছোট নাটক 'সুলভে আগুন ', 'পোকা','জন্মদিন' (নাটক ও নির্দেশনা - অমিতাভ কাঞ্জিলাল)। উল্লেখের দাবি রাখে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এর Can the subaltern speak অবলম্বনে অমিতাভ কাঞ্জিলালের নাটক ' অগ্নিশুদ্ধি'। কোভিড পরবর্তী প্রযোজনা 'পুট', 'কবি ও কঙ্কা', 'ভাগশেষ' (নাটক ও নির্দেশনা— অমিতাভ কাঞ্জিলাল)। প্যাসনেট পারফরমার্স কোভিডের আগে ডেঙ্গি প্রতিরোধে 'মশা কুইট হো' পথনাটক প্রযোজনা করে।

এক ঝাঁক এই প্রজন্মর প্রোজ্জ্বল কুশীলবদের নিয়ে নিয়মিত নাট্য প্রযোজনা করে শিলিগুড়ি বনমালা। কোভিডের আগে বনমালা প্রযোজনাগুলি, 'প্রশ্ন' (নাট্যকার সুবেশ পোদ্দার ও বিশ্বজিৎ রায়, নির্দেশনা - বিশ্বজিৎ রায়) 'ত্রি', 'মধু ও মেহ', 'ওরা কাজ করে', 'জাগৃতি','পতাকা', 'আমি', 'রংরুট', 'সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ' (হিন্দী)। করোনা পরবর্তী সময়ে 'ভাইরাস', 'ভ্যাক্সিনেসন', 'সেরিবা সেরিবান' (নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়), 'চেতনা', 'ডিএডিকসন', 'বিদ্যুৎ', 'স্বপ্ন', 'বলো দুগ্গা মাঈকী', 'চোর সংবাদ' (নাট্যকার কৃপাণ মৈত্র)। অনুল্লিখিত প্রতিটি নাটকের নাট্যকার ও পরিচালক বিশ্বজিৎ রায়।

ব্যতিক্রমী নাট্যচর্চায় 'উত্তরী হাওয়ার' নাম উল্লেখের দাবি রাখে। সাগ্নিক চক্রবর্তী এক প্রতিশ্রুত তরুণ নির্দেশক। নান্দনিক, শিল্পীতীর্থ, নাট্যরঙ্গ, রঙ্গমালঞ্চ, ওপেন সিক্রেট, দর্পণ, অনসম্বল নাট্যদলগুলি নিজেদের সাধ্য-শক্তিতে শিলিগুড়িকে প্রযোজনা উপহার দিয়ে চলেছে।

এরপরেও থাকে শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুলের নাট্যচর্চার কথা। না ! এখন অবধি স্কুলগুলোতে ড্রামা ক্লাব তৈরি করে নিয়মিত নাট্যচর্চা শুরু হয় নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে স্কুলগুলোতে নিয়মিত নাট্যচর্চার একটা পরিবেশ তৈরী হয়েছে। পটভূমিতে আছে ঋত্বিক নাট্য সংস্থা আয়োজিত বার্ষিক স্কুল নাটক প্রতিযোগিতা। বি আই টি এম আয়োজিত বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতাও এক্ষেত্রে একটা ভূমিকা পালন করে। যদিও কোভিডের জন্য মাঝে এই প্রবাহে সাময়িক ছেদ পরেছিল। এবছর ঋত্বিক আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিন্দী বালিকা বিদ্যালয়ের 'যদি এমন হতো' (নাটক - নির্দেশনা — বিশ্বরূপ মিত্র)। নিটোল - নিখুঁত একটি প্রযোজনা - স্কুল পড়ুয়া কুশীলবদের অনুশীলিত অভিনয়- লোকনাট্যের ব্যবহার প্রযোজনাটিকে যে মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল শিলিগুড়ির কোন গ্রুপথিয়েটারে এই ধরণের প্রযোজনা নির্মাণ সাম্প্রতিক সময়ে সম্ভবপর হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। বলতেই হয় শিক্ষক বিশ্বরূপ মিত্র থিয়েটারের একজন গুণী মানুষ, যদিও তিনি তাঁর কাজকে স্কুলের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা নেতাজী গার্লস স্কুলের

'তোতাকাহিনীর পরে'। তরুণ পরিচালক প্রসেনজিৎ সেনের ছিমছাম কাজ অবশ্যই নজর কাড়ে। রবীন্দ্রগল্প নিয়ে একটি সুন্দর প্রযোজনা উপহার দিয়েছে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস স্কুল। নির্দেশক স্বপ্না সেনগুপ্ত। তারা প্রশিক্ষক রূপে পেয়েছিলেন অমিতাভ কাঞ্জিলালের মত পরীক্ষিত নাট্যকর্মীকে। প্রাক কোভিড সময়ে ঋত্বিকের স্কুল নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ছিল জ্যোৎস্নাময়ী স্কুলের। প্রযোজনা 'হন্যমান'। নাটক অমিতাভ কাঞ্জিলালের। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ছিল 'আর্তনাদ'। প্রযোজনা রাজেন্দ্র প্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ডঃ বন্দনা গুপ্তর। এটিও একটি নজরকাড়া কাজ। তবে প্রযোজনাগুলি প্রতিযোগিতাকেন্দ্রিক হওয়ায় শিলিগুড়ির আপামর নাট্যমোদী দর্শকেরা এক্ষেত্রে বঞ্চিতই হয়।

কোভিড সংক্রমণের প্রথম লকডাউনের পর আনলক পর্বে জনজীবন যখন একটু স্বাভাবিক হচ্ছিল, ২০১৯-এর ৬ ডিসেম্বর থেকে বাঘাযতীন পার্কে নবপর্যায়ে শুরু হয়েছিল 'মুক্তমঞ্চ'। সেই প্রতি রবিবার আকাশের নিচে নাটক। এইবার নেতৃত্বে নবীন প্রজন্ম। উপদেষ্টার ভূমিকায় প্রবীণেরা। কিন্তু ২০২০ এপ্রিলের বিধানসভা নির্বাচনের পর কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়লে এক সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার অচিরেই সমাধি ঘটে।

দামামা নাট্য সংস্থার পঞ্চাশ বছর পূর্তির নাট্যোৎসবকে নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম। এই পঞ্চাশ বছর পূর্তিতেই অতিথি পরিচালক শুভাশিস খামারুর '২০৪৭' নাটকটি প্রত্যক্ষ করলাম আমরা। শিলিগুড়ির বিভিন্ন নাট্য সংস্থার স্বনামধন্য কুশীলবেরা এই প্রযোজনাতে অংশ নিলেও প্রযোজনাটি সেইভাবে ছুঁতে পারেনি আমাদের। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল দামামার পার্থ চৌধুরী যদি শহরের নাট্যকর্মীদের নিয়ে একটি কর্মশালা ভিত্তিক প্রযোজনা নির্মাণের উদ্যোগ নিতেন তাহলে বরিষ্ঠ প্রযোজনা উপহার পেত শিলিগুড়ি। স্মৃতিতে তাজমহল, স্বপ্নের জয়, গ্যালিলিও, সুবর্ণ অঙ্গুলি—শিখরশীর্ষ সাফল্যের থিয়েটার সব! শহরে এখন ২০টি নাট্যদল। শিলিগুড়িকে 'থিয়েটারের শহর' অভিধা দিতে যারা ভালোবাসেন তাদের কাছে এই সংখ্যাটি অবশ্যই গর্বের, শ্লাঘার। কিন্তু কোন কোন প্রযোজনার মান এতটাই দুর্বল হচ্ছে যা সত্যিই কষ্টের। একদিকে প্রত্যাশা রইল অগ্রগামী দলগুলির কাছে শক্তিশালী পথফলকপ্রতিম প্রযোজনার জন্য। আর যারা লড়াই করে থিয়েটারটা এখনো করেন তাঁরা প্রযোজনার গুণগত উৎপর্যতা বৃদ্ধিতে একটু ধ্যান দিতে পারে। প্রত্যশা এইটুকুই, ভালো নাটক দেখব!!■

সাম্প্রতিক সময়ে শিলিগুড়ির নৃত্যচর্চা

■ সঙ্গীতা চাকী, সহেলী বসু এবং অদিতি দাস

শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে নাচ নিয়ে কাজ করতে করতে বহুদিন পেরিয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে এই শহরের সাংস্কৃতিক রসে আমরা পুষ্ট। আমরা এই শহরেরই মেয়ে, এই শহরেই আমাদের বেড়ে ওঠা, এই আমাদের কর্মভূ মি। শুধু এই শহর না,কাজের সূত্রে উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নৃত্যচর্চার সূত্রে আমাদের এই শহরের নৃত্য জগতের অবস্থান সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা তৈরি করেছি। ছোটবেলা থেকেই যাদের নাচ দেখে আমরা প্রাণিত হয়েছি তাদের কথা সবার আগে না বললেই নয়। গুরু রুনু ভট্টাচার্যের কাছে তালিম নিয়ে শিলিগুড়ির বেশিরভাগ শিল্পী তাঁদের সাধনা শুরু করেছেন। বলা বাহুল্য অনেকেই এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনামধন্য। গুরু রুনু ভট্টাচার্যের পাশাপাশি সত্য দত্ত,পুষ্প সাহা, চিত্রলেখা বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে অনেক শিল্পীর জন্ম হয়েছে... উল্লেখ্য অলোক চ্যাটার্জী ও মৃদুল চ্যাটার্জির সুপরিচালনায় বিভিন্ন নৃত্যনাট্যগুলি বহুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ও অনেকটাই আধুনিকীকরণ হয়েছে।

বর্তমান মুহূর্তে শিলিগুড়িতে নৃত্যচর্চায় এক বিপুল পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান সময়ে নৃত্য সাধনার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ ও পরিকাঠামো যথেষ্টই অনুকূ ল। বহু শিল্পী নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুদের কাছে তালিম নিচ্ছে।

'শাস্ত্রীয় নৃত্য' বলতে প্রথমে কত্থক এর প্রচলন বেশি ছিল, ধীরে ধীরে মণিপুরী ,ভারতনাট্যম এবং তারপর ওড়িশি নৃত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল। এরপর গৌড়ীয় নৃত্যের প্রচলন বেড়েছে। অতীতে স্বর্গীয় গুরু শ্রী গৌতম সেনগুপ্তের অনুপ্রেরণায় আসামের ক্ষত্রিয় নৃত্য চর্চা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তাঁর অকাল প্রয়াণে এর গতি পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়।

এখন শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাশাপাশি রবীন্দ্র নৃত্য, সৃজনশীল নৃত্যের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। বলাবাহুল্য উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান। সেই সূত্রে লোকনৃত্য সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

এই শহরে বর্তমান সময়ে অনেক শিল্পী শুধুমাত্র মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন নয়, বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত। বিদ্যালয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বেশিরভাগ নৃত্যশিল্পী তাঁদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান তৈরি করে বহু জীবনে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে এই প্রজন্ম পাশ্চাত্য নৃত্যের দিকেও ঝুঁ কছে। বলিউড, সালসা ,হিপহপ এবং বিভিন্ন ধারার পাশ্চাত্য নৃত্যে বেশি উৎসাহী হয়ে উঠেছে এই প্রজন্ম.. টিভি চ্যানেলের বিভিন্ন রিয়ালিটি শো এর পাশাপাশি বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নিয়ে এইসব শিল্পীরা

নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছেন।

এই শহরের বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সময়ে সরকারি বেসরকারি বৃত্তি পেয়েছে, এছাড়া বড় বড় ফেস্টিভ্যালেও অংশগ্রহণ করে তারা শহরকে গৌরবান্বিত করেছেন।এক কথায় বলা যায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাশাপাশি সমান তালে তাল মিলিয়ে আধুনিক ও পাশ্চাত্য নৃত্যধারাকে সঙ্গী করে শিলিগুড়ি শহরের নৃত্যশিল্পীরা নিজেদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই শহরে নাচের জগতের ঐক্যবদ্ধতা সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন সময় এই শহরের নৃত্য শিল্পীরা সারা বছর একসঙ্গে দলগতভাবে অনুষ্ঠান পরিবেশন করে থাকেন। সব প্রজন্মের শিল্পীরা একসঙ্গে মেতে ওঠে বিভিন্ন উৎসবে। মহানগর এর মতন পরিকাঠামো হয়তো নেই এই শহরে, তবুও সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও এখানকার শিল্পীরা তাদের সর্বোৎকৃষ্ট পরিবেশনা সবার সামনে তুলে ধরেন। স্থানীয় শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের মানচিত্রে শিলিগুড়ি নিজের জায়গা করে নিয়েছে। তবে একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন আরও পরিশ্রম আরও অধ্যবসায় আরও নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা... আমরা আশাবাদী।

আমরা শিলিগুড়ির নৃত্যশিল্পীরা মুদ্রায় এবং পদচারণায় এগিয়ে যাব উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে....

‘‘তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম.....’’

‘কণ্ঠশিল্প আবৃত্তি’ এবং আমার শহর শিলিগুড়ি

■ অমিতাভ ঘোষ

মাঠের ধারে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বাঁধা শব্দযন্ত্রে তখন ভেসে আসছিল । ‘‘ঐ খেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই, অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই’’, শুনে ছুটে গিয়েছিলাম ‘মুক্তমঞ্চ’-র পাটাতন বিছানো মঞ্চের সামনে, এখন যেখানে সিটি বুকিং অফিস সেই প্রাঙ্গণে নাটক শুরু আগে তখন আবৃত্তি করছেন শিল্পী। সেখানে তখন অনেক মানুষের ভিড়। আমিও বসে পড়েছিলাম সকলের সঙ্গে মাঠের ঘাসের ওপর। দেখেছিলাম কত কত লোক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আবৃত্তি শুনছে। পাঁচিলের অন্যপারে বিধান রোডেও তখন অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। উদাত্ত কণ্ঠে সেই আবৃত্তি আমি আজও ভুলতে পারিনি। সেটা ১৯৮১ সালে কোনো এক রবিবারের বিকেল। শহরের মানুষের কাছে সে সময়টা আবৃত্তির স্বর্ণযুগ। তারপর মহানন্দা ফুলেশ্বরী দিয়ে দ্রুত গতিতে সময় ছুটে গিয়েছে। প্রায় একই সময়ে শিলিগুড়ি বালক বিদ্যালয়ের কক্ষে প্রতি শনিবার ধারাবাহিক আবৃত্তি অনুশীলন শুরু হয়েছিল। শতফুল আকাদেমির উদ্যোগে সেই শিবিরের আয়োজন করা হত। আবৃত্তি শিল্পীদের ঐ দিনগুলি ছিল ভীষণ আনন্দের। দল বেঁধে আবৃত্তি চর্চা করেছেন ছোটো বড় সকলে মিলে। বিভিন্ন সময়ে প্রখ্যাত আবৃত্তি শিল্পীরা এ শহরে এসেছেন। সকল আবৃত্তি শিল্পীরা বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। শুধুমাত্র আবৃত্তির অনুষ্ঠানে দর্শকাসন পূর্ণ হয়ে উঠেছে - সাক্ষী আছে এ শহর।

‘‘মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক’’

আমার শহরের প্রণম্য আবৃত্তিকারদের গলায় বারে বারে এই উচ্চারণ ধ্বনিত হয়েছে। সহজ জীবন যাপনে অসংখ্য মানুষের জীবনগাঁথা যাঁদের কণ্ঠে শুনেছি, দীর্ঘ তাদের নামের তালিকা। এ শহরের আবৃত্তিকাররা প্রায় সকলেই মিশে রয়েছেন জনারণ্যে , আক্ষরিক অর্থেই আমি তোমাদেরই লোক হয়ে। জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই পরিণত হন এক একজন আবৃত্তি শিল্পী, কণ্ঠে ধারণ করেন স্বরমালা। অগ্রজ আবৃত্তি শিল্পীরা এভাবেই পথ দেখিয়েছেন আগামী প্রজন্মকে।

‘‘আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা স্বপন দোলা নাচিয়ে আয়
আয়রে পাগল আবোল তাবোল মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়’’

ছোট্টো ছোট্টো কচি কচি মুখগুলো এ শহরের বড় প্রিয়। শৈশবের সুন্দর দিনগুলোর সন্ধান দিতে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের আবৃত্তি বিষয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছেন। প্রতিদিনের প্রতিযোগিতা পূর্ণ জীবনের ধরাবাঁধা

ছকের বাইরে একটু আনন্দের উজ্জ্বল মুহূর্তকে খুঁজে পেতে আবৃত্তি অথবা সাংস্কৃতিক চর্চার অবকাশ খুঁজে নিয়েছে অনেকেই। আমাদের বিশ্বাস বিদ্যালয় স্তরে এই ধরনের কার্যক্রম যত বাড়বে শিশুদের বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশ ততই প্রসারিত হবে।

"স্কুলের ব্যাগটা বড্ড ভারী - আমরা কি তা বইতে পারি? কষ্ট হয়!"

এমনই এক অদ্ভুত সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। অভিভাবকদের কথায় উঠে আসে, শহরের একটি নামী বিদ্যালয়ে প্রথমশ্রেণিতে ২০টি বই ১৫টি খাতা তালিকাভুক্ত করেছে। কোন বিদ্যালয়ে বইয়ের সংখ্যা কত? তাই দিয়েই শিক্ষার বিচার হয়। আর তাই অষ্টম শ্রেণিতে উঠতে না উঠতেই বইয়ের পাহাড়ে চাপা পড়ছে শৈশব। পড়াশুনার বাইরেও যে পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমগুলি আমাদের আনন্দে থাকতে শেখায় সেগুলি থেকে সহজেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সত্যি সত্যি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে কি আগামী প্রজন্ম? এই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে আমাদের মনে। তবুও এরই মধ্যে আবৃত্তি চর্চায় উৎসাহিত হয়েছে অনেক নতুন শিল্পীরা। ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে কলেজ পড়ুয়া অনেক আবৃত্তিকার। এখানেই শিল্পের জয়। শুধুমাত্র খাঁচার পাখি না হয়ে অনেকে বনের পাখি হয়ে বাঁচার রাস্তা খুঁজে নিয়েছে। আমরা অবাক হয়ে শুনি, "তোমরা যখন শিখছ পড়া মানুষ হওয়ার জন্য, আমি না হয় পাখিই হব — পাখির মতো বন্য।"

আমার শহর শিলিগুড়িতে এখন অনেক আবৃত্তি সংস্থা নিয়মিত কাজ করছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি সংস্থার নাম সকলের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখছি — সোনার তরী, স্পন্দন, আবৃত্তি তীর্থ, উন্মেষ, অপরাজিতা, কথকতা, উন্মীলন, কণ্ঠস্বর, কথা ও কবিতা, ছন্দবাণী, উবাচ, উত্তরকণ্ঠ, শ্রুতিবিতান, সম্প্রীতি, সৃজন সেনা, উত্তরাপন, কথামঞ্জরী, প্রতিভা, ধানসিঁড়ি।

"আবার না হয় তর্জায় মাতি আয়
আবার না হয় রোদ্দুর বেয়ে হাঁটি"

আবৃত্তি শিল্পীকে প্রতিক্ষণে কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক হতে হবে। আর সে কারণে এই শহরের কবিদের কবিতা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে এ শহরের কবিদের কবিতা নিয়ে আবৃত্তিকাররা মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশন করেছেন ঠিকই তবে চর্চার আরও প্রসার প্রয়োজন। কবি ও আবৃত্তিশিল্পীর যুগলবন্দিতে শতফুল বিকশিত হবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আশার কথা এ সময় এ শহরে আবৃত্তি থাকছে সব অনুষ্ঠানেই। সরকারি-বেসরকারি সমস্ত প্রতিযোগিতায় বহু আবৃত্তিকার অংশগ্রহণ করছে। আবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে যাক আমার শহর শিলিগুড়ি। আগামী প্রজন্ম কথা বলুক কবিতায়।

উচ্চারণে থাক -

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম
শুধু কবিতার জন্য কিছু খেলা
শুধু কবিতার জন্য এক হিম সন্ধ্যেবেলা
ভুবন পেরিয়ে আসা।।

ভাস্কর্যের শিলিগুড়িতে আশার আলো

■ মৈনাক ভট্টাচার্য

পুতুল এবং ভাস্কর্যের মধ্যে একটা বড় ফারাক থাকে। কোন সন্দেহ নেই পুতুলও একটা শিল্প। একে ছোট করার কোন বাসনাও নেই তবে ভাস্কর্য এবং পুতুল দুটোর ঘরানা দুই রকম। পুতুল কখনও কখনও ক্র্যাফটম্যানশিপের উত্তরণে নিজের ঘরানা থেকে বেড়িয়েও আসে, তখন সেই পুতুলই ভাস্কর্যের আধার গুণে আর্টে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু পুতুল যতক্ষণ পুতুল থাকে তার মাধুর্য ভাস্কর্য কোন দিনই গ্রহণ করতে পারেনা। আসলে একটা সৎ ভাস্কর্য সব সময় একক একটা চরিত্র তৈরি করতে পারে, সময়ের কথা বলতে পারে। একটা পুতুল যা কোন দিনই পারেনা। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট হবে হয়ত।

মাথাসর্বস্ব পোষাকহীন গর্ভবতী এক মেয়ের রূপে বালজাকের পুরুষ ভাস্কর্য গড়লেন ফরাসী ভাস্কর রদ্যাঁ, লোকের চিৎকার আর প্রতিবাদে পরে সে মূর্তিকে পরিয়ে দিতে হল বাথরোব(বাথ গাউন)। কিন্তু স্ফীত উদর রেখেই দিলেন। সেখানে কোন সমঝোতা করলেন না। শুধু রদ্যাঁ নয়, ফরাসি ইতিহাসই তো বলে বালজাকের গর্ভেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক ফরাসি উপন্যাস ! বিপ্লব বইকি ! রদ্যাঁ এটাও মানতেন মেধার বিচারে বালজাক এক মগজসর্বস্ব মানুষ। সেই ভাবেই বালজাককে দেখাতে চেয়েছিলেন রদ্যাঁ। ফল কী হয়েছিল। লোকে বললেন, এমন কী ক্রিটিকরাও বললেন, শীল মাছ, কোলবালিশ আরো কত কিছু। যদিও রদ্যাঁর বিচারে তাঁর ভাল কাজগুলির একটা এই ভাস্কর্য। তবু চার দশক ধরে রদ্যাঁর বালজাক খুঁজে পায়নি নিজস্ব ঠিকানা। ভাস্কর্যটি কয়েদ ছিল শিল্পীর স্টুডিয়োতে। মুক্তি পায় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৩৯ সালে। এই রকম একটা মূর্তির সামনে দাঁড়ালে যখন মূর্তির ভেতর থেকে ভাষা বেরিয়ে আসে তখন সেটা হয় একটা সৎ ভাস্কর্য। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। শুধু রদ্যাঁ নয়, ব্রাঁকুসীও নয়; আমাদের দেশের রামকিঙ্কর বেইজ থেকে শর্বরী রায় চৌধুরী, সোমনাথ হোড়, তারক গড়াই, চিন্তামণি কর, নিরঞ্জন প্রধান বা জনক ঝঙ্কার নার্জারী এদের ভাস্কর্যগুলি দেখলেই বোঝা যায়, ভাস্কর্যের নিজস্ব একটা ভাষা থাকে, কৃষ্টি থাকে, নিজের একটা সময়কে ধরে থাকে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এর পক্ষ থেকে ২০১৪-য় শিলিগুড়ির ভাস্কর্য নিয়ে এক সমীক্ষা করা হয়েছিল। শহরে গুটি কয় ভাস্কর্য যেমন রবীন্দ্র মঞ্চের রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ পল্লীর নেতাজি, চিল্ড্রেন পার্কের বিদ্যাসগর, মহানন্দা ব্রীজের সামনের সূর্য সেন, মাল্লাগুড়ির ক্ষুদিরাম আর রবীন্দ্র নগরের জীবনানন্দ দাশ সরণীর রবীন্দ্রনাথ বাদ

দিলে কাউকেই পাস মার্ক দেওয়া সম্ভব হয় নি কাগজের পক্ষ থেকে। এমন কী দার্জিলিং মোড়ের রতন লাল ব্রাহ্মনকে এক নম্বর দিলেও এন.জে.পি'র স্বামী বিবেকানন্দকে শূন্যতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এই সব মূর্তিগুলি এত নিম্ন মানের কাজ যে শহরের মুখ রক্ষা হওয়াই খুব মুশকিল। তাও আবার বসানো আছে কোথায়, না- একটা মাল্লাগুড়িতে আর একটা এন.জে.পি.তে যেটা কিনা আবার এই শহরের প্রবেশদ্বারও। শহরের স্বার্থে কাউকে এই ব্যাপারে দোষী না করে একটা সর্বজনীন সচেতনতা খুব প্রয়োজন। কেননা একটা শহরের শিল্প সমৃদ্ধির প্রথম দর্শনই তো এই পথ-ভাস্কর্য। একটা শহরের কৃষ্টি লেখা থাকে, ইতিহাস তৈরি হয় এই সব মূর্তির ভেতরে। শুধু এই সব মূর্তির মনীষী চরিত্রই নয়, এদের ভাস্কর্য দিয়ে সময়ও বিচার্য হয়ে ওঠে আগামী দশক বা শতাব্দীর কাছে। দুঃখ হয়, আমরা এই শহরে বসে আজও দেখতে পাইনা বিশ্বের, এমন কী ভারতবর্ষের শিল্পগুরুদের ভাল ভাল ভাস্কর্যগুলি। সে সংস্কৃতিটাই এই শহরে আমরা তৈরি করে উঠতে পারিনি। তাই এই সব ভাস্কর্য শিলিগুড়ি শহরে প্রমোট করবার কোন লোক নেই। শিলিগুড়ির ভাস্করদের বাজারদর না থাকায় উঁচু মানের কাজ করবার জন্য উৎসাহিত করবার মত কোন বায়ার্স এখানে তৈরি হয়না। কেননা শিলিগুড়ির প্রয়াত ভাস্কর দেবেন পালের করা গণ্ডার মোড়ের গণ্ডারের যে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকানো তা তো আজও অবাক করা এক মুহূর্ত। তাঁরই মহানন্দার প্রথম সেতুর দুই পারের পিলারের রিলিফের কাজে আজও একটা সময়কে ধরা আছে। সেই ভাবেই তাঁর পুত্র ভাস্কর জয়ন্ত পালের করা রিলিফের কাজ মহানন্দার দ্বিতীয় সেতুর পিলার গুলিতে আর একটা সময়কে ধরে ফেলে। জয়ন্তর সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম কিংবা বিদ্যাসাগরের মূর্তি তাই আজও অনেকের কাছে অভিনন্দিত। জয়ন্ত পালের মত ভাস্করের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এই শহরের ভাস্কর্য শিল্পের একটা শূন্যতা অবশ্যই। ভাস্কর্যে অভিনন্দিত শিলিগুড়ির আর এক চিত্রশিল্পী শংকর দত্তের করা রবীন্দ্র মঞ্চের রবীন্দ্রনাথও। একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট, প্রচলিত সংস্কারের কোনও বিশেষ কারণে প্রায় সব শহরেই মূর্তির দায়িত্ব অর্পিত হয় কৃষ্ণনগর-কুমারটুলি পুতুল ঘরানার অনুসারী কিছু ভাস্করদের উপর। হয়ত আমরা সাধারণ মানুষ খুব স্বাভাবিক ভাবে কোথাও এই ভাস্কর্য পাঠের একটা ভাষা শিখে উঠতে পারিনা। এই পাঠ শেখার জন্য শিলিগুড়ি শহরে মাত্র একটাই স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষ তা রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষ। সেটাও আবার জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৯৮৭র পয়লা নভেম্বর। তার আগে শিলিগুড়িতে ব্যক্তিগত পরিসরে কিছু প্রদর্শনী বাদ দিলে এই রেওয়াজটাই সেই ভাবে ছিলনা। এই কক্ষেও সাধারণ মানুষকে কতটা নিয়ে আসতে পেরেছি আমরা, সেটা একটা ভাবনার বিষয়। সে যাই হোক, একটা আশার কথা, এখন মানুষ আজকের দিনে এসে তবুও আগের চেয়ে এই ব্যাপারগুলিতে আনেক বেশি সচেতন। শিলিগুড়ির জন্য আশার আলো দেখিয়ে শহর সাজানোর এক বৈঠকে, বর্তমান মেয়রের আমন্ত্রণে গত ২৯ নভেম্বর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাস্কর্য বিভাগের প্রধান সন্দীপ চক্রবর্তীকে ডাকা হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে সমস্ত শিলিগুড়ি জুড়ে যোগেন চৌধুরীর মত শিল্পীরা ভাস্কর্যের একটা পরিকল্পনার চিত্রায়ন করবার ভাবনা সেরেও ফেললেছেন। এই ভাবনার বাস্তবায়ন হলে আমরা কিন্তু শিল্প মনস্কতার ভাস্কর্য ভাবনায় আবার অনেকটাই সাবালকত্ব ফিরে পাব। যেটা উত্তরবঙ্গ পর্যটনের মুখ্য শহরদ্বার শিলিগুড়ি শহরের কৃষ্টির জন্য খুব ফলদায়ী হবে কোন সন্দেহ নেই।■

শিলিগুড়ির চিত্রশিল্প চর্চা প্রসঙ্গে দু'চার কথা

■ সুদীপ্ত রায়

সময়টা খুব সম্ভবত সত্তর দশকের প্রথম দিকে আমার ছোটবেলার পাড়ার থিয়েটার মঞ্চ মিত্র সম্মিলনী। পুরনো মিত্রসম্মিলনী হলে থিয়েটার হত মাঝে মাঝেই। একদিন হঠাৎ করে দেখলাম মিত্র সম্মিলনীর টিনের বেড়ার দেয়াল জুড়ে সাদা কাপড় মুড়ে দেয়া হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। বেশ কয়েকজন মানুষ কাজ করছেন আর তা দেখাশোনা করছেন এক পরিচিত ভদ্রলোক যিনি আমার দিদিকে গান শেখাতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কী হবে? কারণ আমার অভিজ্ঞতায় কখনো দেখিনি নাটক বা থিয়েটার করতে দেওয়াল সাদা কাপড়ে মুড়ে ফেলতে হয়। জিজ্ঞাসা করাতে বললেন এখানে আমার আঁকা ছবির প্রদর্শনী হবে। সেদিনের কিশোর অবাক হয়ে ভাবলাম ছবির প্রদর্শনী ব্যাপারটা কি? যাই হোক বেশ একটা টানটান উত্তেজনা নিয়ে পরদিন প্রদর্শনী দেখতে গেলাম। প্রদর্শনীর শিরোনাম ছিল 'দেবতার গ্রাস'। শিলিগুড়ির ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম ও একক ছবির প্রদর্শনী। শিল্পী ছিলেন নির্মল চৌধুরী। এরপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরো একটি কবিতা নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী করেছিলেন। সেই সময় ছবি ও প্রদর্শনী সম্পর্কে জানতে পারি এটাই বা কম কিসের। সময় চলতে থাকে। মফস্বল শহর বড় হতে থাকে। শিলিগুড়ি চিত্রশিল্প প্রসঙ্গে আসতে হলে আমাদের কিছু মানুষ (শিল্পী)-কে মনে করতেই হবে। শচীন পাল ছিলেন পেশাদার শিল্পী। সিনেমার পোস্টার, নাটকের পোস্টার আঁকতেন। দক্ষ আঙুলের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠত। কী অনায়াস দক্ষতায় এঁকে ফেলতেন সেই অসাধারণ ছবিগুলো, শুধু তাই নয়, পুজো প্যান্ডেলের সাদা কাপড়ের উপর রংবেরঙের যে অসাধারণ আলপনা দেখেছি তার ব্যঞ্জনা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সেটাই ছিল হস্তশিল্পের একমাত্র ডেকরেশন। আমার মনে আছে শংকরদাকে, অত্যন্ত রাশভারি প্রকৃতির মানুষ। প্রকৃতপক্ষে শিলিগুড়িকে ছবি আঁকা শিখিয়েছিলেন তিনিই। তিনিই প্রথম শিখিয়েছিলেন ছবি ও ফটোর মধ্যে প্রভেদ কোথায়। ছবি আঁকার পাশাপাশি ভাস্কর্য শিল্পেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে আবক্ষ মূর্তিটি আজ বাঘাযতীন পার্ক মঞ্চের সংলগ্ন মঞ্চের পাশে রয়েছে সেটি তাঁরই সুদক্ষ হাতে তৈরি। যশস্বী শিল্পী নির্মল চন্দ মহাশয় শিলিগুড়িতে প্রথম আঁকার স্কুল খোলেন নিজের বাসভবনে। তাঁর হাতে তৈরি বহু প্রতিভাবান শিল্পী আজ এই শহর তথা উত্তরবঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। সময়ের সারণী বেয়ে অনেক অনেক নতুন প্রতিভাবান শিল্পী উঠে আসতে শুরু করলেন। তাঁরা তাদের শিল্পকলার সম্ভার মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছিলেন। কিন্তু বাধা ওই একটি সুচারু প্রদর্শনী কক্ষের। দীনবন্ধু মঞ্চের সঙ্গে যদিও বা তৈরি হল রামকিঙ্কর

প্রদর্শনী কক্ষ, তার হাল বেহাল। অনেক পরে সময়ের দাবিতে তার খোল নলচে বদলে নতুন করে সাজলো রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষ, কিন্তু তাতেও বাধা। কোন এক উর্বর মস্তিষ্কের কল্যাণে তার দেয়াল সাজানো হলো সরকারি নোটিশ বোর্ডের ধরণে। তাতে বাধাপ্রাপ্ত হলো শিল্প। আসলেই একটা শহর সুন্দর হয় নৃত্য গীত, নাটক-থিয়েটার, খেলা ধুলার সাথে সাথে, শিল্প কলার সৌজন্যে। সেক্ষেত্রে শিল্পকলা এই শহরে ব্রাত্যই থেকে গেল। প্রয়োজন ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্ট কলেজের। সেটা তো আমাদের মাত্রাতিরিক্ত চাওয়ায় পর্যবসিত হয়েছে। একটা আন্তর্জাতিক বা জাতীয় মানের প্রদর্শনী কক্ষ এখনো তৈরি করা গেল না এই শহর তথা উত্তরবঙ্গের কোন প্রান্তে। নব্বইয়ের দশকে গড়ে ওঠা একটি সংস্থা, নর্থ বেঙ্গল আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটের দাবি ছিল এই শহরকে ঋদ্ধ করার জন্য একটা আর্ট কলেজ, একটি আর্ট আর্কাইভ ও একটি জাতীয় মানের আর্ট গ্যালারির। কিন্তু সে দাবি শোনার মতো প্রশাসন কোথায়...।

একসময়, সন ২০১০ সালে, ফুলবাড়ির নিজবাড়ি এলাকায় রবীন্দ্র ভারতীর আদলে একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যেখানে অঙ্কন শিল্পের সঙ্গে ভাস্কর্য শিল্প, নৃত্য, গীত, নাটক, মিউজিক, অভিনয় ইত্যাদি শেখানো হবে...। তার শিলান্যাস করা হয়েছিল বাম আমলের শেষের দিকে রবীন্দ্রভারতীর মাননীয় উপাচার্যের উপস্থিতিতে। উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছিল বটে তবে তা এখন চল্লিশ বাঁও জলে... নর্থবেঙ্গল আর্টস এন্ড ক্রাফ্টসের উদ্যোগে প্রতিবছর এখানে এই রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তের প্রথিতযশা তথা নব্য, প্রতিভাবান শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে প্রদর্শনী হত। সেখানে যোগ্য শিল্পীদের মেরিট সার্টিফিকেট ও নগদ আর্থিক পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হতো। এই সংস্থার এই অসাধারণ প্রয়াসও কাউকে উজ্জীবিত করতে পারেনি উত্তরবঙ্গের কোথাও একটি আর্ট কলেজের ব্যবস্থাপনা করে তোলার ক্ষেত্রে। বাম আমলেও অনেক প্রতিশ্রুতির পরেও হয়নি, এখনো হয়নি। উত্তরবঙ্গের অসংখ্য শিল্পীদের বহুদিনের এই একটি সামান্য দাবি পূরণ করা কি নিতান্তই অসম্ভব...। প্রশ্নটা কি থেকেই যায় না?

এই দাবি পূরণ না হওয়ার ফলস্বরূপ কত কচিকাঁচা প্রতিভাবান শিল্পীদের আমরা অনায়াসে হারিয়ে ফেলছি, প্রতিদিন। অংকুরে বিনষ্ট হচ্ছে ভবিষ্যতের পিকাসোরা। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো ছবি আঁকার স্কুল। যে পারে সে শেখাবে, তবে যে পারে না সেও শেখায়। বিনষ্ট হচ্ছে প্রতিভারা...

জানিনা ভবিষ্যতে কী হবে। এই শহর থেকেই প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত ও আবির কর্মকারের মতো শিল্পীরা আন্তর্জাতিক মানের শিল্পী। এমন কি কেউ নেই, যিনি উদ্যোগ নিয়ে শহর শিলিগুড়ি তথা চির বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের বুকে একটা সর্বাঙ্গীণ, বহুমাত্রিক শিল্পকলা কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন... অন্ততপক্ষে একটা উদ্যোগ নিতে পারেন... যার জন্য আমরা শিল্পীরা গর্বিত হতে পারি, উজ্জীবিত হতে পারি...। তিনি যেই হোন, আপামর উত্তরবঙ্গবাসী তথা শিল্পীদের পক্ষ হতে তাঁকে অনেক অনেক অগ্রিম ধন্যবাদ জানানো রইল।■

দার্জিলিং জেলার রাজবংশী ভাষায় সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চা

■ বিশ্বজিৎ রায়

সম্প্রতি ২০১০ সালে ড. গিরিজাশংকর রায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাহিত্য আকাদেমির পক্ষ থেকে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার জন্য বিশেষ ভাষা সম্মান পান। আর তার ঠিক পরের বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১১ সালে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য আকাদেমি গঠন করে দেন। এর পরেই রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার গতিপ্রকৃতি নতুন মাত্রা পেতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক যুগেই হোক, আর স্বাধীনতা উত্তর যুগেই হোক , সেই অর্থে রাজবংশী ভাষার সাহিত্য সম্ভার এখনও খুব বেশী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। এর মূল কারণ অবশ্যই উপযুক্ত শক্তিশালী লেখকের অভাব এবং ভাষা-সাহিত্য চর্চার অভাব। যাই হোক, ড. গিরিজাশংকর রায় 'রাজবংশী' নামটি প্রথম খুঁজে পেয়েছেন তন্ত্রশাস্ত্র 'ভ্রামরীতন্ত্রে'। যে শ্লোকটিতে 'রাজবংশী' নামটি রয়েছে তা হল ,

''নন্দীসূতভয়াদ্ভীমে পৌণ্ড্রদেশাদ সমাগতা।
বর্দ্ধনস্য পঞ্চপুত্রাঃ স্বর্গনৈর্বান্ধবৈ সহ।।
রত্নপীঠঃ বিবাসন্তে কালাৎ বিপ্রাদরসঙ্গমাৎ।
ক্ষাত্রধর্ম্মাদপক্রান্তা রাজবংশী খ্যাতা ভূবি।।'' ,

ড. রায়ের মতে 'ভ্রামরীতন্ত্র' দশম শতাব্দীতে লেখা। এবং তিনি মনে করেন যে, 'চর্যাপদ'ই হল রাজবংশী ভাষার প্রথম নিদর্শন। তাঁর মতে চর্যাপদের পদকারেরা অনেকেই উত্তরবঙ্গ তথা কামরূপের অধিবাসী ছিলেন। এছাড়াও তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও রাজবংশী ভাষার উপাদান পেয়েছেন। তিনি মনে করেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আসলে কুচবিহার-রংপুর অঞ্চলের কানাই ধামালি। অন্যদিকে কুচবিহারে বসে রাজবংশী ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদ করছেন মাধব দেব। তাঁর রামায়ণ 'মাধব কন্দলি'। দুর্গাবর ও মানকর হলেন রাজবংশী ভাষায় প্রথম মনসামঙ্গল রচয়িতা। অধ্যাপক রায় ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গান বা রাজবংশীদের মতে যুগীর গানে রাজবংশী ভাষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ খুঁজে পেয়েছেন —

''কাহারো দুয়ার কাহো না যায়,
কাহারো পুখুরীর জল কাহো না খায়।
আথানের ধন কড়ি পাথালে শুকায়।

হেন দুঃখিত কাঙাল নাই ধরিয়া পালায়।
ঘিনে বান্দী না পিন্দে পাটের পাছেড়া,
একতন তেকতন করি যে খায় তারও দুয়ারৎ বান্ধা ঘোড়া।
পাতাবেচা হ্যা রাইয়ত পাত বেচেয়া খায়,
স্ত্রী পুরুষ যুক্তি করি হাতী কিনিবার চায়।
খড়িবেচা হয়া রাইয়ত ঘড়ি বেচেয়া খায়,
স্ত্রী পুরুষ যুক্তি করি দালান দিবার চায়।"

১৯০৩ সালে জর্জ আব্রাহাম গিয়ারসন সাহেবের 'Linguistics Survey of India' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে সেখানে দেখা যায় যে, দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের ভাষা সমীক্ষা করে তিনি বলেছেন 'বাহে ভাষা'। পরবর্তী সময়ে 'বাহে' শব্দটি নিয়ে রাজবংশী সমাজে বহু বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সাহিত্যিক সমরেশ বসু, দেবেশ রায় সহ বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকই সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

এখন আমরা দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যের সাম্প্রতিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার পথিকৃৎ হিসেবে অধ্যাপক ড. গিরিজাশংকর রায়ের নাম প্রথমেই স্মরণে আসে। তিনি রাজবংশী ভাষায় 'বাউদিয়া রায়' ছদ্মনামে সাতজন কবিকে নিয়ে প্রথম একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন ১৯৬১ সালে। এই সংকলনের সাতজন লেখক হলেন , বাউদিয়া রায়, বাসুদেব সেন, রাধানাথ দাস, কলীন্দ্রনাথ বর্মণ, বিনোদবিহারী বর্মণ, হেমকান্তি রায় এবং তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর গিরিজাশংকর রায়ের লোকনাটক চোরচুন্নি, জোনাকি, উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ প্রথম ভাগ (ভাষা ও ছড়া), দ্বিতীয় ভাগ (উপকথা) এবং তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজাপার্বণ' প্রকাশিত হয়। 'সাতভাইয়া' সংকলনটির সূত্র ধরে উত্তরবঙ্গ, অসম ও নেপালের রাজবংশী সমাজের বহু রাজবংশী কবি এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বাচ্চামোহন রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, বীরেন রায়, গোকুল রায়, অসমের দ্বিজেন্দ্রনাথ ভকত, নেপালের ফুলসিং রাজবংশী প্রমুখ। লক্ষণীয় যে, এই সময় থেকেই অরাজবংশী সমাজের বহু লেখক রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন।

১৯৭৬ সালে শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয় 'পোহাতীয়া তারা' নামে একটি পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ রায়। বেশ কিছুদিন চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর খড়িবাড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ বর্মণ 'করতোয়া' এবং 'পূবালী' নামে দুটি উন্নতমানের পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'করতোয়া' পত্রিকায় কবি বীরেন রায়ের বহু কবিতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকা দুটিও বেশ কিছুদিন

চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। এরপর রাজবংশী ভাষা-সাহিত্যের আঙিনায় ভইভই আলো নিয়ে ২০০৩ সালে হাজির হয় 'ডেগর' পত্রিকাটি। বলাবাহুল্য রাজবংশী সাহিত্যে 'ডেগর' পত্রিকার অবদান অপরিসীম। এই পত্রিকার সম্পাদক একাধারে রাজবংশী ও বাংলা ভাষার কবি, কথাকার, অধ্যাপক এবং প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে ইতিমধ্যেই বাঙালি ও রাজবংশী সমাজে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর মুনশিয়ানায় এবং 'ডেগর' পত্রিকাটির হাত ধরে রাজবংশী ভাষা-সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। ২০২২ সালের অক্টোবর মাস থেকে 'ডেগর' পত্রিকাটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখন প্রতি মাসে এই পত্রিকাটি এক হাজার সংখ্যা ছাপা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আজীবন এবং বাৎসরিক গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। 'ডেগর' পত্রিকায় একাধারে প্রকাশিত হয়ে চলেছে রাজবংশী উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনী, উককথা, কিচ্চা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন এবং নানা ধরণের সংবাদ। এই পত্রিকাটির হাত ধরে বিগত দুই দশক ধরে উত্তরবঙ্গ, নিম্ন অসমসহ নানা প্রান্তের বহু লেখক, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক উঠে এসেছেন। রাজবংশী ভাষার যে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য তাও বিভিন্ন লেখায় নানাভাবে উঠে এসেছে এই পত্রিকার হাত ধরে। আজও বহু মানুষ বিভিন্ন ছদ্মনামে এই পত্রিকায় লিখে চলেছেন। শুধুমাত্র কবিতা বিষয়ক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বিচন' শিবমন্দির থেকে প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘদিন। সম্পাদক অধ্যাপক দীপক কুমার রায়। এই পত্রিকাটি প্রথম দিকে অসমের কোকরাঝাড় থেকে প্রকাশিত হত। কারণ তখন অধ্যাপক দীপক কুমার রায় অসমের কোকরাঝাড় সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগ দেবার পর শিবমন্দির থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। অতি সম্প্রতি ২০২১ সাল থেকে শিলিগুড়ি থেকে 'পুলি' রাজবংশী ও বাংলা ভাষায় একটি দ্বিভাষিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। 'পুলি' পত্রিকার সম্পাদক এই প্রবন্ধের লেখক নিজে। এখনও পর্যন্ত 'পুলি'র দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই দুটি সংখ্যা থেকেই 'পুলি' মহীরূহ হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দুটি সংখ্যার মধ্যে প্রথম সংখ্যায় ইতিমধ্যে একটি সমগ্র রাজবংশী উপন্যাস এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় দুটি রাজবংশী উপন্যাস ছাড়াও একাধিক ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ও পাঠকের সহযোগিতা পেলে 'পুলি' হয়ত আগামীদিনে চারাগাছ থেকে মহীরূহে পরিণত হতে খুব বেশী সময় লাগবে না। এছাড়াও আর একটি পত্রিকা শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে শিক্ষক কমল রায়ের সম্পাদনায়। এই পত্রিকাটির নাম 'গোচরপনা'। আরও অনেক পত্র-পত্রিকা প্রাবন্ধিকের অগোচরে রয়ে গেল, সুযোগ পেলে পরবর্তী সময়ে সেগুলি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আকঙ্ক্ষা রইল।

দার্জিলিং জেলার অবসরপ্রাপ্ত কৃতী শিক্ষক শিক্ষারত্ন নগেন্দ্রনাথ রায় রাজবংশী ভাষা-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাঁর জন্ম ১৯৫৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর জলপাইগড়ি জেলার গড়ালবাড়ি অঞ্চলের নালাগঞ্জে হলেও তিনি পাকাপাকিভাবে দার্জিলিং জেলার শিবমন্দিরে হালের

মাথা অঞ্চলে বসবাস করছেন। শিক্ষারত্ন নগেন্দ্রনাথ রায় রাজবংশী ভাষায় একাধারে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদসহ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক অনুবাদ করেছেন। ক্রমানুসারে তাঁর গ্রন্থগুলি হল , 'নিগমাঞ্জলি', (রাজবংশী ও বাংলা ভাষায়) ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। 'নিগম কাথা' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। কাব্যগ্রন্থ 'হোকলখলি' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। 'শ্রী শ্রী গীতা আঙ্গ' প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৯৮ সালে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১৭ সালে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্যের রাজবংশী ভাষায় অনুবাদ 'চণ্ডালিকা' প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। 'রাজবংশী গুরুগীতা' প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। ২০১২ সালে রাজবংশী শিশুদের জন্য প্রকাশিত হয় 'ছাওয়ালি পাঠ , ১' গ্রন্থটি। 'কুলের গুরু কুলগুরু' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০২০ সালে। এগুলি ছাড়াও তাঁর বৃহৎ অনুবাদের কাজ 'রাজবংশী বাল্মীকি রামায়ণ' এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধ অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণ পাবনচরিত' অনুবাদ করে ফেলেছেন। যে গ্রন্থ দুটি শীঘ্রই প্রকশিত হবে। এছাড়াও তিনি 'শ্রী শ্রী চণ্ডী আঙ্গ' অনুবাদ করেছেন। বলাবাহুল্য অনুবাদের মধ্য দিয়ে রাজবংশী ভাষার গদ্যকে তিনি যেভাবে ত্বরান্বিত করে চলেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। রাজবংশী ভাষা-সাহিত্যের ঊষালগ্নে শিক্ষারত্ন নগেন্দ্রনাথ রায় অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে রাজবংশী শব্দ শিল্পের যে বিপ্লব সংঘটিত করে চলেছেন তা রাজবংশী গদ্য সাহিত্যে ইতিহাসে অমরত্বের দাবী রাখে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ড. অমলকান্তি রায় 'ডেগর' ও 'পুলি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। 'ডেগর' পত্রিকায় তিনি ইতিমধ্যেই রাজবংশী ভাষায় বেশকিছু ছোটগল্প ও মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর ছোটগল্পে আধুনিক রাজবংশী সাহিত্যের নানাদিক ফুটে উঠেছে। এছাড়াও তিনি বাংলা ভাষার একজন প্রখ্যাত গবেষক। ইতিমধ্যেই একাধিক বাংলা গবেষণা গ্রন্থ তিনি প্রকাশিত করেছেন। এছাড়া তাঁর সহধর্মিণী পাঞ্চালী সিনহাও নিয়মিত 'ডেগর', 'পুলি' পত্রিকায় রাজবংশী কবিতা লিখে থাকেন। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক গিরীন্দ্রনারায়ণ রায় রাজবংশী সমালোচনা সাহিত্যে ইতিমধ্যেই নতুন নতুন দিক নিয়ে যেভাবে আলোচনা করেছেন, তাতে রাজবংশী সাহিত্য নিঃসন্দেহে অন্য মাত্রা লাভ করেছে। তাঁর বিখ্যাত 'সাংস্কৃতিক রাজনীতি কামতাপুরী রাজবংশী ও বাংলা প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থে তিনি বেশ কিছু প্রকাশিত রাজবংশী উপন্যাস, ছোটগল্পের নানা দিক অত্যন্ত সুচারুভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি একাধারে রাজবংশী, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখে থাকেন। তাঁর সহধর্মিনী নিয়তি রায় দীর্ঘদিন ধরেই 'ডেগর' পত্রিকায় রাজবংশী ছোটগল্প লিখে চলেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি রাজবংশী ছোটগল্পের একটি সংকলন করবেন বলে স্থির করেছেন, যা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়াও নিয়তি রায় বেশকিছু বাংলা উপন্যাস লিখেছেন এবং সেগুলি কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিখিলেশ রায়। তিনি একাধারে কবি,

গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক এবং প্রচ্ছদ শিল্পী। তাঁর সম্পাদিত একাধিক রাজবংশী ও বাংলা ভাষার পত্রিকা জনমানসে যেভাবে সাড়া জাগিয়েছে, তেমনটি আর কোন পত্রিকা জাগাতে পারে নি। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলি হল , রাজবংশী - 'মাসকিয়া উত্তরবঙ্গ', 'ডেগর', ভোগা' এবং বাংলা , 'বেহাগ', 'অন্যকাগজ', 'বৈরাতি' 'মাগুরমারী', এছাড়াও কখনও রাজ্য ভাওয়াইয়ার স্মরণিকার বিভিন্ন সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন। সম্পাদক হিসেবে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর ক্ষুরধার লেখনী থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। রাজবংশী ভাষায় তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ 'সম্পাদকীয়, এবং 'কালনাত্তির কবিতা' দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে। 'মাসকিয়া উত্তরবঙ্গ' সম্পাদনার সময় যে সম্পাদকীয়গুলি লেখা হয়েছিল, সেগুলি সংকলন করে প্রকাশিত হয়েছে 'সম্পাদকীয়' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে রাজবংশী আধুনিক গদ্যভাষার ক্ষুরধার প্রয়োগ তিনি যেভাবে করেছেন, তা রাজবংশী সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। যেমন , ''আমার ভাষাত একটা লেখা লেখিলে, কথা কহিলে কাঙো কাঙো এলাঙ মুখ টেরিয়া করি দেখে, কাঙো কাঙো ইয়ার ভিতিরা আলেদা আর একটা উদ্দেশ্য ঘোকটে নিকিলির চায়। আর ঝায় আরও বেশী মুর্খ তায় তো সাহস করিয়া কয়ায় ফেলায় কামতাপুরী।" , এহেন গদ্যভাষা থেকেই স্পষ্ট যে, কে এল ও আন্দোলনের সময় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের দমন-পীড়নে সমগ্র রাজবংশী যুবসমাজ কী ধররের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। শুধু তাই নয়, রাজবংশীরা যে চারিদিকে প্রবল ঘৃণারও মুখোমুখি হয়েছিল সেকথাও অতি স্পষ্ট হয়ে যায় এখানে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে সে সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'কালনাত্তির কবিতা' কাব্যগ্রন্থটিও একইরকম সময় ও সংকটের দলিল। এ কাব্যের কবিতাগুলিতেও রাজবংশী জাতির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবলতর সংকটের চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে।

এই জেলার আর একজন কৃতী অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায়। তিনি পূর্বে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন, এখন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় রত আছেন। বসবাস করেন শিবমন্দিরে। অধ্যাপক দীপক কুমার রায় রাজবংশী ভাষার সব্যসাচী লেখক। অসমে কোকরাঝাড় সরকারি কলেজে অধ্যাপনার সময় থেকেই তিনি 'ডেগর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজবংশী ভাষায় লেখালেখি শুরু করেছেন, যা এখনও ঝড়ের গতিতে অব্যাহত রয়েছে। তিনি একাধারে মূলত কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, পত্রিকা সম্পাদক। কবিতা বিষয়ক তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'বিচন' বহুদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি রাজবংশী ভাষায় 'উজানী' পত্রিকাটি কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদনা করে চলেছেন। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষক পরিশ্রমী এই মানুষটির বিচিত্র কর্মকাণ্ডে রাজবংশী সমাজ এবং ভাষা-সাহিত্য অন্য মাত্রা পেয়েছে। রাজবংশী ভাষায় তাঁর প্রাকাশিত গ্রন্থগুলি হল , 'হাবিলাস'(২০১২) এটি রাজবংশী কবিতার সংকলন। 'রাজবংশী সমাজ আরো সংস্কৃতির কাথা'(২০১২) গ্রন্থটি হল রাজবংশী প্রবন্ধ সংকলন। যেখানে নিম্ন অসম এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশী

সমাজের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। 'ইচিৎ বিচিৎ কাথা' (২০১৭) গ্রন্থটিও বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। এই প্রবন্ধগুলিতে রাজবংশী ভাষার বিভিন্ন সংকট নানা প্রশ্নের মাধ্যমে উত্থাপন করা হয়েছে। 'নুনিয়া ধানের ভাত' (২০২২) গ্রন্থটি একটি টুকরো টুকরো গল্পের সঙ্কলন। এই লেখাগুলি ২০১০-২০২০ সালের মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ের নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো স্মৃতি। এছাড়াও বহু অগ্রন্থিত রাজবংশী প্রবন্ধ তাঁর রয়েছে, যেগুলি এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এর পাশাপাশি রাজবংশী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে তিনি বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখেছেন। বেশ কিছু প্রকাশিত হয়েছে, কিছু প্রকাশকের ঘরে প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছে। লোকসংস্কৃতি গবেষণার পাশাপাশি তাঁর আগ্রহের বিষয় মনীষী পঞ্চানন বর্মার জীবন ও সাহিত্যকর্ম।

দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী ভাষা-সাহিত্যচর্চার ধারাকে পরিপুষ্ট করে চলেছেন চটহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রেমানন্দ রায়। তিনিও একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক। শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজবংশী ও বাংলা ভাষায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা তাঁর নেশা। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান এবং চারপাশের প্রকৃতিজগৎ যেন অবলীলায় ধরা দেয় তাঁর কবিতায়। রাজবংশী কবিতায় তাঁর শব্দ প্রয়োগ এবং ছন্দের ব্যবহার খুব সহজেই রাজবংশী এবং বাঙালি পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাঁর প্রথম রাজবংশী কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমকালের কবিতা' ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর ২০১০ সালে তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আন্ধার বড় জ্বালা' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের নাম কবিতা 'আন্ধার বড় জ্বালা' কবিতাটি পাঠ করলেই রাজবংশী ভাষায় কবির দক্ষতা পাঠককে আকর্ষণ করে। এরপর ২০১১ সালে কবির 'মোর কয়খান আভং কবিতা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। প্রেমানন্দ রায়ের বহু রাজবংশী কবিতা যেমন আবৃত্তি করা হয়, তেমনি তিনি রাজবংশী ভাষার কবি হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। শিলিগুড়ি, শিবমন্দির থেকে রাজবংশী ভাষায় লিখে চলেছেন শিক্ষক নৃপেণ বর্মন। তিনি বাংলা ও রাজবংশী দুটি ভাষাতেই লেখেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ 'ডেরাঘর' বাংলাদেশের একটি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। এছাড়াও তিনি 'মাসকিয়া উত্তরবঙ্গ' এবং 'ডেগর' এই দুটি পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর সহধর্মিণী শিখা রায় তাঁর সঙ্গেই রাজবংশী ভাষায় গল্প, কবিতা লিখে চলেছেন। দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের পাঁচালি গানের প্রখ্যাত গিদাল উধাসু রায় তাঁর বৈচিত্র্যময় শিল্পী জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের জীবনচরিত রচনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর অধ্যাপক নিখিলেশ রায়ের হাত দিয়ে উধাসু রায়ের জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছে ২০২২ সালে।

শিবমন্দির আঠারোখাই হাই স্কুলের সহকারী প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পরেশ চন্দ্র রায় রাজবংশী ভাষার আর একজন গুণী শিল্পী। তিনি একাধারে দক্ষ বাঁশী বাদক, সংগীত শিল্পী, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে চলেছেন ক্রমাগত। রাজবংশী ভাষায় তাঁর ট্রিলজি উপন্যাস

'বাতাসীর বাসিয়া কাথা' (২০১২) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড 'বাতাসীর কাথা' খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তরাই অঞ্চলের লাহাংকারী গান নিয়ে তাঁর গবেষণাধর্মী রাজবংশী ভাষায় প্রবন্ধ সংকলন 'তরাই অঞ্চলের লাহাংকারী গান' খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হবে। শিলিগুড়ি গেটবাজারে বসবাসকারী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এছাহক আলী রাজবংশী ভাষায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। মূলত রাজবংশী লোকসাহিত্য তাঁর আগ্রহের বিষয়। তিনি রাজবংশী প্রবাদ প্রবচন নিয়ে রাজবংশী-বাংলা-ইংরেজি ভাষায় একটি বৃহৎ গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছেন। যে গ্রন্থটি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। নকশালবাড়ি, কেষ্টপুর নিবাসি বসন্ত বর্মণ 'ডেগর' পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লেখেন। তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অভিমান' প্রকাশিত হয়েছে শিলিগুড়ি রাজবংশী আকাদেমি থেকে। এছাড়াও কামতাপুরী আন্দোলনের সময় প্রতিবাদী কিছু কবিতা লিখেছেন বুড়াগঞ্জ নিবাসী চন্দ্রমোহন সিংহ। ফাঁসিদেওয়া নিবাসী মনোজ সিংহ নিয়মিত রাজবংশী ভাষায় 'ডেগর' পত্রিকায় কবিতাচর্চা করে চলেছেন। এছাড়াও আরও বহু লেখক হয়ত আমার তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেলেন, যাঁরা নিয়মিত রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন। আমি তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারি নি, এটা একান্ত আমার অক্ষমতা। পরবর্তীকালে সে অভাব পূরণ করার চেষ্টা করব।

এছাড়াও শিলিগুড়িতে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। নর্থবেঙ্গল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, নর্থবেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার, শিলিগুড়ি রাজবংশী আকাদেমি, পুলি পাবলিকেশন প্রভৃতি। শিলিগুড়ি রাজবংশী আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছ বেশ কিছু রাজবংশী ভাষার বই , নিখিলেশ রায়ের 'সম্পাদকীয়', 'কালনাত্তির কবিতা', অভিজিৎ বর্মণের চারটি কাব্যগ্রন্থ, 'ঢেসা ধানের সমাই', 'শাক তুলিনু বেছিকুছি', 'ঘান্টি ফুলের কটপ', 'তোরে বাদে' এবং রাজবংশী ভাষার একটি জনপ্রিয় উপন্যাস 'বাথান', বাচ্চামোহন রায়ের 'আসোল ঘাটা', বসন্ত কুমার বর্মণের 'অভিমান', প্রসেনজিৎ রায়ের 'জীউ', শিবপ্রসাদ রায়ের 'ফুটিক জল', প্রখ্যাত কবি সন্তোষ কুমার সিংহের 'কবিতা কুক্কুরার সুতা' এবং শিক্ষারত্ন নগেন্দ্রনাথ রায়ের 'রাজবংশী গুরু গীতা' রাজবংশী ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থ। অন্যদিকে সদ্য প্রস্ফুটিত 'পুলি' পাবলিকেশন থেকে প্রথম বছর ২০২২ সালে যে সকল রাজবংশী ভাষার বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল , জগদীশ আসোয়ারের 'রাজবংশী সনেট' যেখানে রয়েছে লেখকের লেখা ৬০ টি মৌলিক সনেট এবং ৩০ টি শেকসপীয়রের সনেটের অনুবাদ। মোট ৯০ টি রাজবংশী সনেট গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। যতীন বর্মা ও বিনোদবিহারী বর্মা সম্পাদিত 'রাজবংশী কবিতা সংকলন' গ্রন্থটি একটি বিখ্যাত কবিতা সংকলন। নব্বইয়ের দশকে এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল, তারপর নিঃশেষিত হয়ে যায়। এবছর পুনরায় 'পুলি' পাবলিকেশন থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। ভগীরথ দাসের 'উপন্যাস সংগ্রহ'। রাজবংশী ভাষায় এই প্রথম কোন লেখকের চারটি উপন্যাস একত্রে করে প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস সংকলন প্রকাশিত করেছে 'পুলি'

পাবলিকেশন। উপন্যাস চারটি হল , 'সেন্দুকের ছোড়ানি', 'ডাঙ্গর আঈ', 'কানা হুদুমের গান' এবং 'মাশান মঙ্গল'। এছাড়াও শৈলেন দাসের একটি রাজবংশী গল্প সংকলন 'ছেঙা ঢাকা অসুখ' এবং ঊমাকান্ত রায়ের একটি রাজবংশী কবিতা সংকলন 'রিপু করা স্বপন' শিলিগুড়ি 'পুলি' পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই হল দার্জিলিং জেলায় রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। যাঁরা বাদ পড়ে গেলেন, সেটা একান্তই লেখকের আপনাদের কাছে পৌঁছতে না পারার ব্যর্থতা হিসেবেই পরিগণিত হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১। শিক্ষারত্ন নগেন্দ্রনাথ রায় , হালের মাথা, শিবমন্দির, দার্জিলিং।
২। শিক্ষক পরেশ চন্দ্র রায়, মেডিকেল মোড়, শিবমন্দির, দার্জিলিং।
৩। অধ্যাপক গিরীন্দ্রনারায়ণ রায়, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।
৪। অধ্যাপক নিখিলেশ রায়, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। অধ্যাপক দীপক কুমার রায়, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।
৬। শিক্ষক প্রেমানন্দ রায়, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি।
৭। শিক্ষক নৃপেণ বর্মণ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

পুনরুচ্চারণ

এই বিভাগে শিলিগুড়ির প্রয়াত একজন বা দুজন
সৃজনশিল্পীদের রচনা প্রতি সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হবে।

ফেরাই

■ চোমং লামা

০১

একটু আগে ঝিরঝির করে সামান্য বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। চুল না ভেজা জামা কাপড় না ভেজা অল্প বৃষ্টি। তবে আকাশ জোড়া ঘন কালো মেঘ গাভীন গরুর মতো থম মেরে রয়েছে। এখনো বেলা শেষ হয়ে যায়নি। মেঘের জন্য আলো আঁধারি এক আলো ছায়া অন্ধকার নেমে এসেছে শহর কলকাতায়। অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছে। ট্রাম বাস ট্যাক্সিতে ওঠার জন্য অফিস ফেরত যাত্রীদের মরণপণ লড়াই। পরপর চারখানা বাস যাত্রীদের তুলছে।

বেচারাম একটা বাস লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়েছিল। বাসটার দরজায় কম করেও তিরিশ চল্লিশ জন মানুষ যুদ্ধই করছিল বলা যায়। ঠিক সময় বুঝে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে গলিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় সিঁড়িতে ঠেলাঠেলি করা এবং যাত্রীদের ভিড়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হওয়া একজন বয়স্ক যাত্রীর পাঞ্জাবির বাঁদিকের পকেট থেকে তার মানিব্যাগ তুলে নিয়েই বেচারাম একটা উল্টো লাফে ফুটপাতে নেমে এলো। একটা হল্লা উঠলো , পকেটমার, পকেটমার। বেচারাম ফুটপাত ধরে দৌড় দিল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ওর পেছন পেছন চার পাঁচজন লোক নেমে দৌড়ে আসছে। বেচারাম ফুটপাতের উপর তাঁবু খাটিয়ে কাপড় বিক্রি করা একটা দোকানের পেছন দিক দিয়ে উল্টো মুখে দৌড়ালো। লোকগুলো এখনো পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছে। তবে এখনো কতজন ওর পেছনে আছে তা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার সুযোগ নেই। সামনে একটা গলি দেখে বেচারাম সেখানে সেঁধিয়ে গেল। গলিতে মেরামতির কাজ চলছে। গাঁইতি দিয়ে গলিটার অনেকখানি জায়গা জুড়ে পিচ, ভাঙা ইট বের করে দেওয়া হয়েছে। বেচারাম টের পেল, সব লোক চলে গেলেও দুটো লোক ওকে ধাওয়া করে গলিতে ঢুকে পড়েছে। দুটো বাড়ির মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা, যেখানে পাঁচ সাতটা পিচের ড্রাম সাজানো ছিল। ওই ড্রামগুলির পেছনে গিয়ে বসে পড়ল। লোক দুটো দৌড়ে আরও এগিয়ে এল। বেচারাম উঠল না। একটু পরে ওরা হাঁটতে শুরু করল। বলাবলি করছিল, - একটুর জন্য ধরা গেল না। গলি ঘুপচি ধরে ওরা এখন বড় রাস্তার দিকে চলে গিয়েছে। বেচারামকে ধরার আর উপায় নেই। লোক দুটো চলে যাওয়ার পরেও বেচা আরো কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর আবছা আলোতে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই বিপত্তি। ওর দু তিনটে পিচের ড্রামের পরেই একটা মেয়ে মানুষ ঘোমটা টেনে বসে আছে। হালকা আলোতে যুবতী মেয়ে বলেই মনে হল বেচারামের। খানিকটা ভয়ার্ত গলাতেই বলে উঠলো - কে ওখানে কে ? যুবতীটি উঠল না বরং আরো খানিকটা ঘোমটা টেনে দিল। বেচারাম বলল - উঠে এসো বলছি নয়তো চিৎকার করবো। চোর, বদমাশ, ছিনতাইবাজ না পকেটমার দেখতে হবে তো।

যুবতীটি ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালো। বেচারাম ওর মুখোমুখি হয়ে পকেট থেকে সিগারেট লাইটার বের করে

জ্বেলে যুবতীটির মুখ দেখে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসলো।

- এ যে দেখছি পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। তা এখানে কেন মাইরি। চলো ওই ভাঙ্গা গ্যারেজটায়। বেচারাম ওর হাত ধরে টানল। যুবতীটি ছটফট করে ওর হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে বলল, আমার হাত ছেড়ে দাও।আমাকে যা ভেবেছ আমি তা নই। আমাকে ছেড়ে দাও। বেচারাম হেঁচকা টানে ওকে পাশের একটা ভাঙাচোরা গ্যারেজের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

০২

ওরা দুজন যখন গলিটার ভিতরে লাইটপোস্টের নিচে এসে দাঁড়ালো তখন গলিতে লোক চলাচল কমে গিয়েছে। বেচারাম আবার একটা সিগারেট ধরালো। বেচারাম লক্ষ্য করল যুবতীটি আঁচল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছছে। ওর চোখে স্পষ্ট দুই ফোঁটা জল।বেচারাম পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা তোমার পাওনা।

যুবতীটি ঝাঁজের সাথে বলল, তোমার টাকা তুমি পকেটে রাখো। আমি নষ্ট বা দুষ্টু না। আমি শরীর বেচি না। বেচারামের হাত থেকে সিগারেট খসে পড়ে। অপরাধী কণ্ঠস্বরে বলল - তাহলে ওখানে অমন করে বসেছিলে কেন? যুবতীটি বলল তা দিয়ে তোমার কাজ কী? তোমার কাজ হয়ে গিয়েছে তুমি চলে যাও। বেচারাম বলল আমি তো আমার ঘরে ফিরে যাবো। তুমিও তোমার ঘরে ফিরে যাও। যুবতীটি বলল আমার ঘর নেই।

ঘর নেই ? আশ্চর্য তো, তোমার কোন লোক নেই? যুবতী বলল - স্বামী ছিল, না খেতে পেয়ে এই কলকাতার রাস্তায় পড়ে মারা গেছে। এখন পথে পথে ঘুরি। হোটেলে হোটেলে মানুষের পাত কুড়ানো এঁটোকাঁটা খেয়ে বেঁচে থাকি। বেচারাম বুকের ভিতর কেমন যেন একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল। গলার মধ্যে কিছু একটা দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, বলল - চলো।

- কোথায় ? যুবতীটি বলল।

- একটা ঘরের চালের তলে। হোটেলে পাত কুড়াতে হবে না। নিজের হাতে নুন ভাত, ডাল ভাত ফুটিয়ে খাবে। যুবতীটি বেচারামের আপাদমস্তক ভালভাবে লক্ষ্য করল। বেচারাম বলল - আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না, তাই না? যুবতীটি সে কথার কোন জবাব দিল না। বেচারামের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের মুখখানা নিচু করে রইল।

- অবশ্য বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। আমি মানুষটা ভাল না, কিন্তু তোমার মত ভাল মেয়ের সঙ্গে এই ব্যবহার করাটা আমার উচিত হয়নি। তোমাকে একটা ঘরে ওঠাতে পারলে, একটা ঘর গিরস্তি দিতে পারলে, আমার পাপের প্রাচিত্তির হবে। যাবে আমার সঙ্গে ?

যুবতীটি বলল- চলো।

বস্তিটা বেশ বড় তবে এক টেরেতে তিন চার খানা খোলার ঘর, টিনের ঘর আর টালির ঘরও আছে। বাইরে কাউকে অবশ্যই দেখা গেল না। বেচারাম একটা টালির ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারলো।

-এই ফড়িং, ফড়িংরে - ভর সন্ধেবেলায় ঘুমের বাহার দেখো। ফড়িং এসে দরজাটা খুলে দিল। সাত আট বছরের লিকলিকে একটা ছেলে। একটা শত ছিন্ন হাফ প্যান্ট পরনে। সে পরাও যা না পরাও তাই।

ফড়িং বলতে যাচ্ছিল, ভর সন্ধ্যাবেলায় এসে কী রংবাজি শুরু করলে? কিন্তু একটা অচেনা যুবতী মেয়ে ছেলে দেখে বলল - এ কাকে ধরে আনলি মাইরি?

-চিনতে পারছিস না? বেচারাম বলল ,তোর মায়ের বোন মাসি হয়। ও এখন থেকে এখানেই থাকবে।

ফড়িং তার ছেঁড়া প্যান্টের ভেতর দিয়ে পাছা চুলকতে চুলকাতে বলল তুমি কামাল করলে মাস্টার। ওস্তাদকে তো খবরটা দিতে হয়। বেচারাম বলল - যা খবরটা ওস্তাদকে দে। বিপনে, সাধুচরণ, বৃন্দা, পুলিন, বোষ্টমকেও খবর দে। এ এখানে থাকবে। না হলে আমি তোর এই মাসিকে নিয়ে বস্তি ছেড়ে চলে যাব।

ফড়িং এর হাঁক ডাকে সবাই উঠোনে এসে জড়ো হল। যে যার ঘর থেকে মোড়া, ভাঙা চেয়ার নিয়ে এসে জড়ো হয়ে বসল। এদের সবার ওস্তাদ, বুড়ো এবং খোঁড়া কাদের আলী। বিপনে, সাধুচরণ আরও সবাই হাজির। ওস্তাদ একটা হাঁক দিল। এই বেচা, বেচা। কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস, তাকে সবার সামনে নিয়ে আয় একবার।

আগে বেচারাম পেছনে ঘোমটা টানা যুবতী মেয়েটি।

- কিরে ? কী খবর তোর ? একে কোথা থেকে ধরে আনলি? অস্থান কুস্থানের মেয়ে নাতো ?

০৩

বেচারাম দুই কানের লতি চেপে ধরল, আর এক হাত জিভ বের করল।

- তাহলে ব্যাপারটা কী ? বুড়ো ওস্তাদ কাদের আলী জিজ্ঞাসা করল।

- সে অনেক বৃত্তান্ত ওস্তাদ। বেচারাম বলে, একটা বাসের দরজায় অপারেশন করছিলাম। অনেকগুলো লোক পকেটমার পকেটমার বলে ধাওয়া করেছিল।একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। একটা ভাঙা গ্যারেজের কাছে অনেক পিচের ড্রাম ছিল ওই জায়গায় লুকিয়ে পড়লাম। লোকগুলো চলে গেলে উঠতে যাব দেখি পিচের ড্রামের আড়ালে এই মেয়ে বসে আছে। প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সাহস করে হাত ধরে টেনে তুললাম। লাইটার জ্বেলে মুখ দেখলাম। অভাবে অনটনে মুখটা যা দেখলাম তাতে মনে হল এই মুখটাই হয়তো একদিন পাকা টমেটোর মত ছিল। বেচারাম থামলো। কারো মুখে কোন কথা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওস্তাদ কাদের আলী বলল, আগে বল বেচা।

- কী আর বলব ওস্তাদ। বেচারাম বলল, ওর হাত ধরে টেনে নি। ভাঙাচোরা গ্যারেজটার মধ্যেই নিয়ে গেলাম। ওখানেই একটু অসুবিধা হয়ে গেল। কথাটা শোনামাত্র যুবতীটি আরো একটু ঘোমটা টেনে দিল।

-ওকে দশটা টাকা দিতে গেলাম। তা ও ঝাঁঝের সাথে বলল, আমি নষ্ট না দুষ্ট না। তারপর ওর বৃত্তান্ত শুনলাম। সত্যি সত্যি ও গেরস্থ ঘরের বউ। কী বলবো ওস্তাদ- নিজের পরেই খুব রাগ হতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল, নিজের পায়ের জুতো খুলে নিজের গালে কয়েক ঘা মেরে দিই। নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখলাম, হার্টটা কেমন যেন মাগুর

মাছের মত লাফাচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ বেন্দা বোস্টম তার একতারা আর খঞ্জনী নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বৈরাগী নাচ নেচে ঘুরে ঘুরে গাইল -

ও তুই ঘরে খুঁজিস বাইরে খুঁজিস
মিছেরে তোর আনাগোনা,
ও সে পথের ধুলোয় আছে পড়ে
তোর মনের মানুষ কাঁচা সোনা...।

ঘোমটা টানা যুবতীটি আরো একটু ঘোমটা টেনে দিল। বিপিন, সাধুচরণ, পুলিন প্রবল আপত্তি জানালো—

- আমাদের আখড়ায় মেয়েছেলে চলবে না।

ওস্তাদ কাদের আলী বলল - এই কোন গুরুচরণ তোর নাম সাধুচরণ রেখেছিল রে ? হারামজাদা বেলদার বোষ্টমী ললিতা সখি এই আখড়ায় ষোল বছর বাস করে গিয়েছে না ? ও নতুন একটা বোস্টম ধরে পালিয়ে না গেলে ললিতা সখি আজও এই আখড়ায় বাস করত।

বিপিন উঠে দাঁড়িয়ে বলল - তুমি যতই বলো না ওস্তাদ, এখানে মেয়েছেলে থাকলে তাকে তাড়াবই।

- যা যা ক্ষমতা থাকলে তাড়াস। কাদের আলী চিৎকার করে ওঠে।

রাতে নিচে ফড়িং আর যুবতী একসঙ্গে শুয়েছিল। পাশের একটা চৌকিতে বেচারাম। ফড়িং ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে সে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বেচারামের বিছানায় গিয়ে বসল। বলল , ঘুমোচ্ছ ? বেচারাম উঠে বসল।

বলল- তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার নামটি কী গো ?

- যমুনা।

- ফড়িং তোমার কে হয় গো ? যমুনা জিজ্ঞেস করল।

বেচারাম সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল ও ব্যাটা কারো কিছু হয় না। বেজন্মা ভদ্রলোকের ঘরের কেলেঙ্কারি।

০৪

ওই বুড়ো ওস্তাদ যখন লাইনে কারবার করতো তখন রাতের বেলায় ওকে লাইনের পাশে ঝোপের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিল। সদ্য জন্ম নেওয়া। ট্যাঁ ট্যাঁ কেঁদে যাচ্ছিল। ওস্তাদ ওকে কুড়িয়ে নিয়ে এল। তখন ওই বেন্দা বৈরাগীর একটা বৈষ্ণবী ছিল ললিতা সখী। ওস্তাদ ওকে ললিতা সখীর কোলে তুলে দিয়েছিল। একদিন ললিতা সখী এক নতুন বোস্টম ধরে পালিয়ে গেল। ফড়িং রয়ে গেল।

হঠাৎ বেচারাম জিজ্ঞেস করল - তোমার বাড়ি কোথায় ছিল যমুনা ?

-মেদিনীপুর। আমাদের আট বিঘে তিন ফসলি জমি ছিল। সংসারে আমরা মাত্র দুজন মানুষ। চাষবাস করে দুজনের

ভালভাবে চলে যেত। কিন্তু কেলেঘাই নদীর তা সহ্য হল না।

গত সনের বর্ষায় সেই নদী আড়াইশ বিঘা জমি গ্রাস করে নিল। যমুনা আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। গাঁয়ে কাজ পাওয়া যায় না। তারপর দুবেলা দুমুঠো ভাতের খোঁজে মানুষটার হাত ধরে কলকাতায় চলে এলাম। কিন্তু কোথায় ভাত? মানুষটা না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে মারা গেল। বেচারাম আর শুনতে পাচ্ছিল না। বসেও থাকতে পারলো না। রুমালে মুখ চেপে সে একটা উদ্যত কান্নাকে দমন করার চেষ্টা করছে।

যমুনা উঠে এসে ওর পাশে দাঁড়ালো - কী হল গো তোমার? অমন করছ কেন? বেচারামের কণ্ঠস্বর তখন কান্নার কাছাকাছি। বলল - আবার গাঁয়ে ফিরে যাবে যমুনা? তোমার গাঁয়ে নয়? আমার গাঁয়ে? তোর্ষা নদীর পাড়ে।

স্টেশন থেকে নেমে এক মাইল রাস্তা। হলুদবরণ সরষে খেত আর সবুজবরণ মটরশুঁটি খেত পার হয়ে পুটিমারি গাঁ। তোর্ষা বয়ে চলেছে ছলছল করে। সেই নদীর চরে আমার বারো বিঘে জমি। তোর্ষা সে জমি কোনদিন গ্রাস করতে পারবেনা। সরকার বাঁধ দিয়ে দিয়েছে।

যমুনা চোখ বড় বড় করে বলল, সর্বনাশ ! তোমার নিজের জমি থাকতে তুমি কলকাতায় এসে পকেটমারি ছিনতাই চুরি ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়াচ্ছ ? বেচারাম বলল কপালের ফের। ষোলো সতের বছর বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে বাউন্ডুলে হয়ে গিয়েছিলাম। নেশা ভাং মদ গাঁজা খেয়ে ভেবেছিলাম - গাঁয়ে নয় কলকাতায় গিয়ে ফুর্তি করব। জমি বেচে দিতে চেয়েছিলাম। আমার দুই কাকা বাধা দিল। বললো জমি বেচিস না বেচা। তুই তো এক সময় বে থা করে ঘর সংসার করবি। তখন দেখবি এই জমি কাজে লাগবে। আমরা চাষাবাদ করি। দরকার হলে তোকে আমরাই টাকা পাঠাব। তারপর বউ নিয়ে যখন ঘরে ফিরবি, তখন তোর জমি তোকে ফেরত দিয়ে দেবো।

যমুনা বলল - তুমি কি মানুষ ? বারো বিঘা জমি ফেলে রেখে —

বেচারাম বলল - তোমাকে পেয়ে সব কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে বউ।

- আরো ওলট পালট হবে। তুমি কাল ওস্তাদকে বলে দাও যে তুমি আমাকে আর ফড়িংকে নিয়ে তোর্ষা নদীর পাড়ে ফিরে চলে যাবে। ফড়িং আমাকে মাসি মাসি করে। ওকে আমি নিয়ে যাব।

সব শুনে ওস্তাদ বলল - তুই খুব ভালো ভেবেছিস ব্যাচা। এই গোলকধাঁধার কোন শেষ নেই। মানুষের মতো যখন বাঁচতে চাইছিস - যা তাই বাচ। তা কবে যাবি ভেবেছিস ?

বেচারাম বলল, পরশুদিন হাওড়ায় গিয়ে গাড়ি ধরব। বেচারামের কথা শুনে সাধুচরণ আর বিপিন উঠে চলে গেল। বেন্দা তার মোড়াতে বসেই একতারা আর খঞ্জনি বাজিয়ে গিয়ে উঠল -

হায় হায় মানব জীবন হাওড়া স্টেশন হেথায় আপডাউন এর গাড়ি চলে
টিকিট কেটে ওঠো রে মন। ও তোর অ্যাক্সিডেন্টের ভয় যে মিছে
সবুজ নিশান উড়িয়ে দিয়ে গার্ডসাহেব তোর আছে পিছে
ও তুই পরান খুলে হুইসেল বাজা গাড়িতে কেমনে হবে কলুষণ।।

০৫

ওস্তাদ বলল, খুব ভালো বলেছিস বেন্দা। বেন্দার গানখানা মনে রাখিস বেচা। হঠাৎ আসরে জনা তিনেক মুচিপাড়া থানার সেপাই এসে হাজির। দুজনের হাতে বেঁটে লাঠি। একজন তার লাঠিখানা বগলে নিয়ে খৈনি টিপতে টিপতে এসেছে।

ওস্তাদ কাদের আলী বলল - কী ব্যাপার ? সিপাহীজি তোমরা ?

খৈনি টেপা পশ্চিমা সেপাই বলল - খবর বহুত বুরা বা। তালতলা থানা ইলাকার দুইজন আমেরিকান টুরিস্টের ব্যাগ লোপাট হইয়ে গেল। তালতলা থানা হামার মুচিপাড়া থানায় খবর ভেজলো কি তালতলা থানার মাস্টারদের সাথে বেচারামের ইয়ার দোস্তি আছে। তো হামার থানার সাহেব হুকুম দিল, বেচারামকো পকড় কে লে আও। উও টুরিস্টদের ব্যাগ পাওয়া গেলে বেচারামকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বেচারাম ঝট করে লাফ দিয়ে উঠে বলল , ওস্তাদ, এ ওই বিপনে আর সাধুচরণের কাজ। ওরা আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, আমি কেমন করে ওই বউ আর ফড়িংকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাই, তা ওরা দেখে নেবে। তোমার মনে আছে ওস্তাদ ? ওস্তাদ বলল - মাথা গরম করিস না বেচা। বেচারাম বলল - তোমার বউ বেটির মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি ওস্তাদ, আর কোন ঝুট ঝামেলায় জড়াবো না। না হলে বিপিন আর সাধুচরণকে দেখে নিতাম। পশ্চিমা সেপাই বলল - কেন ঘাবড়াতে হো বেচারাম ? একদিন ইয়া দো দিনকা মামলা। ও তালতলা থানা বহুত জলদি মাল পাকড় লেগা। বড়বাবু ভি জানতা হ্যায় কি ইয়ে তুমহার কাম না আছে। লেকিন ক্যায়া করে আমেরিকান টু রিস্ট হ্যায় না। বহুত সিরিয়াস কেস। যা, তোর ঘরওয়ালির সাথে দেখা করে আয়।

যমুনা ঘরে চৌকির পরে বসে ফড়িংকে জড়িয়ে ধরে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল। বেচারাম যমুনার মাথায় হাত রাখল। বলল - কেঁদোনা বউ। পুলিশের ব্যাপার তো তুমি জানো না । আমি কাল-পরশুই চলে আসব। তুমি দেখে নিও। একদিক দিয়ে ভাল হল বউ। কলকাতায় এসে অনেক পাপ করেছি। কলকাতার পাঁক, কলঙ্ক সব কলকাতাতেই রেখে যাই। তারপর নতুন জীবন। তোর্ষা নদীর পাড়ে বারো বিঘা জমিতে ফসল ফলাব। মটর, মুগ, ছোলা, খেসারি হবে। ফুটি, তরমুজ ফলাব। পাকা ধানের আঁটিতে উঠোন ভরে যাবে। তুমি স্নান করে ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে নিকোন উঠোনে নতুন চালের গুঁড়ো দিয়ে উঠোনজুড়ে আলপনা দিয়ে পৌষলক্ষ্মীর ব্রত করবে। পিঠে পুলি পায়েস আর নলেন গুড়ের গন্ধে ঘরদোর ভরে উঠবে। আমি সন্ধ্যায় পাড়ার লোকজন ডেকে এনে উঠোনে বসে ভাওয়াইয়া, চটকা দরিয়া গানের আসর বসাব। জীবন বয়ে চলবে তোর্ষা নদীর স্রোতের মতো, ছলছল, ছলছল - ছলছল ।■

পুরনো সে দিনের কথা

বিমলেন্দু দাম

প্রদীপ জ্বালতে গেলে আগে সলতে পাকাতে হয়। তেমনি জীবনের একটা বিশেষ অধ্যায়কে স্মৃতির গর্ভগৃহ থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে গেলে তার নেপথ্য প্রস্তুতি, খবরাখবর ও কিছুটা জানানো দরকার। প্রস্তুতিপর্বের প্রসঙ্গ এড়িয়ে প্রস্তুতপর্বের কথা বলা যায় না।

সেই প্রস্তুতি পর্বটা শুরু হয়েছিল কৈশোরের সূচনালগ্নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বলি হয়ে উজান অসমের মারঘেরিটা শহর থেকে উদ্বাস্তু হয়ে দেশ-গাঁয়ের বাড়িতে থিতু হয়েছিলাম। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার এক অখ্যাত গ্রামে ছিল আমার পৈতৃক অভিজন। বাবা স্কুলশিক্ষক। আমার সাহিত্য চেতনার উন্মেষ তাঁরই প্রেরণায়। তিনি কালেভদ্রে কবিতা লিখতেন। আখ্যানধর্মী কবিতা। অধিকাংশই কৌতুকের সামগ্রী। কোনোদিন তা ছাপার মুখ দেখেনি। স্কুলের কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে কোনো ছাত্রকে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে পাঠ করান হত। সেরকম একটি কবিতা আগাগোড়া আমারও মুখস্থ ছিল। এই শিলিগুড়ি শহরেই একদিন বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসুকে বাবার লেখা সেই হাসির কবিতা শুনিয়ে বাহবা পেয়েছিলাম ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একবার ভিটেছাড়া হয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার হলাম দেশভাগের দরুন। উনিশশো আটচল্লিশের জুনে খানকতক বইমাত্র সম্বল করে এবং একবুক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে সম্পূর্ণ একা অজানা উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু পথ হারাইনি। তখন প্রায় সবমানুষের হৃদয় ছিল। হৃদয়ে ভালোবাসা ছিল। ভালোবাসায় খাদ ছিল না। তাই সহজেই একটা আশ্রয় জুটে গিয়েছিল। বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে কাকদ্বীপ। তখন তার কৌলীন্য ছিল না। সুন্দরবন ঘেঁষা এই অঞ্চলকে বলা হত লাট অঞ্চল। এই লাট অঞ্চলেরই এক অজ পাড়াগাঁ শিবকালীনগর। সেখানে খাওয়া-থাকার সুবিধেসহ বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। উনিশশো পঞ্চাশে সেখানকার ঈশান মেমোরিয়াল হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

আগেই বলা হয়েছে, সাহিত্য বিষয়ে একটা বোধ আমার মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল কৈশোরের উন্মেষলগ্নেই। দেশের বাড়িতে থাকাকালীনই তার প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল। তখনও লিটলম্যাগ সম্পর্কে কোনো ধারণা আমার ছিল না। পত্রপত্রিকা পড়তে ভালো লাগত। বিজ্ঞাপন দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকে সে-সব আনাতাম, আর গোগ্রাসে গিলতাম। একদিন হঠাৎ মাথার মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবনা উকি দিল। সেই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে প্রকাশ করলাম পারিবারিক হাতে লেখা পত্রিকা। কিছুকাল চলল। তারপর দেশ ভাগ হওয়ায় সব বানচাল হয়ে গেল।

কাকদ্বীপে এসে আবার সেই নেশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তখন আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। সহপাঠীদের নিয়ে ছড়া লিখে মজা করতাম। স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছড়া পড়ে শোনাতাম। আধুনিক কবিতার সঙ্গে তখনও আমার পরিচয় হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু এঁদের কাউকেই তখন চিনতাম না ।

চিনতাম না মানে এঁদের কারুর কবিতার সঙ্গেই পরিচায় ঘটেনি। তখনও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার মত বয়স হয়নি। বড়জোর রবীন্দ্রানুসারী দু-চারজন কবিকে ভালোমত চিনতাম। কিন্তু সেই সময় কোনোদিন তাঁদের ব্যর্থ অনুকরণও করতে চেষ্টা করিনি। তবে গল্প লেখার চেষ্টা ছিল। মনে আছে, কলকাতার এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পত্রিকায় একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম। কৌতুকরসের গল্প। তাকে ঠিক ছোটগল্পের মর্যাদা দেওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, গল্পের শেষে একটা চমক ছিল। এরকম চমক দেওয়া কৌতুককর গল্প পরবর্তীকালে আরও দু-চারটে লিখেছিলাম। ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু তবু আমি গল্পকার হই নি।

কাকদ্বীপ-পর্ব শেষ হয়েছিল উনিশশো পঞ্চাশের মার্চে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে আর ওমুখো হইনি। তখন থেকে শুরু হয়েছিল ছন্নছাড়া জীবন। খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে এখানে-সেখানে যা পেয়েছি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছি। টেনে ডাঙায় তোলার মত কেউ ছিল না। বয়স তখনো আঠার হয়নি। তাই সরকারি-বেসরকারি কোনো সংস্থাতেই চাকরি জোটেনি। অগত্যা বছর দেড়েক বাদে ফিরে গেলাম মা-বাবার কাছে সেই দেশের বাড়িতে। দেশ তখন বিদেশ। বাস্তুভিটে আছে, কিন্তু সে ভিটে আঁ কড়ে ধরে থাকার মত সঙ্গতি ছিল না। আবার সে ভিটে ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে পাড়ি দেবারও সাহস ছিল না দ্বন্দোদুল্যমান মন নিয়ে নিরুপায় বাবা-মা থেকে গেলেন। আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম মুসাফিরের মত। আমারই একজন অনক্ষর শিক্ষানুরাগী আত্মীয়ের হাত ধরে চলে এলাম শিলিগুড়ি শহরে। সময় উনিশশো বাহান্নর জানুয়ারি

সবে আঠারো পেরিয়েছি। স্বপ্ন দেখার বয়স। আমি বোধ হয় একটু বেশি-বেশিই স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন ছিল বলেই হাজারো আঘাতেও ভেঙে পড়িনি। স্বপ্নের সঙ্গে সাধনাকে যুক্ত রেখেছিলাম। বড় হব। অধ্যাপনা করব। লিখব। আমার লেখা ছাপা হবে। দশজন পড়বে। তারিফ করবে। এই উচ্চাশাই আমাকে টেনে নিয়ে যেত সামনের দিকে। বই পড়তাম নেশাখোরের মত। যেখানে যা পেতাম সব। এমন কি, কোনো সাহিত্য-পত্রিকার পাতায় বানানো ঠোঙা পেলে তাও ছিঁড়ে পড়ার অভ্যাস ছিল। ভাবতাম, 'যেখানে পাইবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই, পাইলে পাইতে পারে অমূল্য রতন।' মনে আছে, কাকদ্বীপে থাকাকালীন স্থানীয় গ্রামীণ পাঠাগার থেকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আগুন নিয়ে খেলা' বইখানা এনেছিলাম পড়ব বলে। আকস্মিকভাবে ধরা পড়ে যাই হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে। বইখানা কেড়ে নিয়ে যথাস্থানে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তখন তরুণদের চোখে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মস্ত লেখক। বিশেষ করে তাঁর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ত। আমিও একবার নয়, বেশ কয়েকবার পড়েছি।

এই বই পড়ার নেশা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে পরবর্তী জীবনে। শিলিগুড়িতে এসে যখন কলেজে ভর্তি হলাম, তখন ভারতনগরের একটি উদার পরিবারে আশ্রয় পেয়েছিলাম। ভারতনগর তখন শিলিগুড়ি শহরের একটি প্রত্যন্ত পাড়া। ওপার বাংলার কিছু উদ্বাস্তু পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাড়িঘর করে বসবাস করছে। এদের সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা হল। শ্যামল চৌধুরী ('উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ কর্মরত ছিল) তখন শিলিগুড়ি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে কলকাতার আশুতোষ কলেজে বি.এ. পড়ে। ওর বাবা ছিলেন ডাক্তার। ভাব হয়ে গেল শ্যামলের সঙ্গে। আর সেই ভাব থেকে কিছু সাহিত্য করার ভাবনার উদয়। আরও কয়েকজনকে নিয়ে গড়া হয় একটি সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। নাম

'তরুণতীর্থ'। পাঠাগার তৈরি হল। 'তীর্থরেণু' নামে হাতে লেখা দেয়াল-পত্রিকা বেরুল। সে দারুণ উন্মাদনা।

শ্যামল চৌধুরী তখন গল্প লিখত। আয়তনে ছোট, কিন্তু বাঁধুনি ছিল। তখন বাংলা ছোটগল্পে এখনকার মত এত ডিটেলিং-এর কাজ ছিল না। ইংরেজিতে যাকে বলে 'কম্প্যাক্টনেস', সেটাই ছিল ছোটগল্পের বড় বৈশিষ্ট্য। আর ছিল একটা চমকপ্রদ উপসংহার। গল্পের শেষটাই গল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলত। এখনকার বেশিরভাগ গল্প শেষ হয় পাঠকের তৃপ্তিকে উপেক্ষা করে। মাঝপথে গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেলে যেমন গাড়ির গতি থেমে যায়, তেমনি একালের ছোটগল্পও পাঠককে মাঝপথে নামিয়ে দিয়ে বলে গল্প আর এগোবো না ।

শ্যামল চৌধুরী শেষপর্যন্ত গল্পকার না হয়ে কবি হন। কবিতাও যে খুব বেশি লিখেছেন তা নয়। মাত্র একখানাই কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে।

আমি যখন শিলিগুড়িতে এলাম তার বছর দেড়েক আগে এখানে আত্মপ্রকাশ করে 'মহানন্দা' নামে একটি সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদনা করতেন অরুণ মৈত্র। অন্য যারা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের সবার কাছেই আমি এক নগণ্য অর্বাচীন। লেখকপদবাচ্য হবার যোগ্যতা তখনও অর্জন করতে পারিনি। তাই সমবয়স্কদের নিয়েই শুরু করে দিলাম সাহিত্যের ঘর-সংসার। তবে হ্যাঁ, এরই মধ্যে একটা জায়গায় আমি আমার ক্ষমতা যাচাইয়ের একটুখানি সুযোগ পেয়েছিলাম। সত্যরঞ্জন মজুমদার তখন বের করতেন সাপ্তাহিক 'শিলিগুড়ি পত্রিকা'। কেন জানি না, তিনি আমাকে দায়িত্ব দিলেন ওই পত্রিকার ছোটদের পাতাটি সম্পাদনা করার। একটিমাত্র পাতা আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। তার জন্য পারিশ্রমিক পেতাম মাসে পনের টাকা। লেখালেখির দৌলতে সেই প্রথম আমার উপার্জন।

শিলিগুড়ি কলেজে পড়াকালীন সঙ্গী পেয়েছিলাম প্রদ্যোতকুমার সরকার ও মৃগাঙ্কশেখর দত্তকে। দু'জনেই তখন বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু দুজনেই সাহিত্যমনস্ক। সেই সাহিত্যের ভূতই একদিন চেপে বসল প্রথম প্রদ্যোতের ঘাড়ে। অচিরেই সে ভূত পরপর আরও অনেকের কাঁধে চালান হয়ে গেল। তৈরি হয়ে গেল একটা গোষ্ঠি। জন্ম নিল পাক্ষিক 'সংযোগ' পত্রিকা। শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক সংবাদ ও সাহিত্যের বাহন এই পত্রিকাটি মূলত ছিল ছাত্রছাত্রীদের মুখপত্র। কিন্তু মাত্র দু'বছরেই পত্রিকাটি সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং উত্তরবঙ্গে তো বটেই, উত্তরবঙ্গের বাইরেও বহু জায়গায় এর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সংযোগ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যারা ছিল তাদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা প্রদ্যোতকুমার সরকার বেঁচে নেই। মৃগাঙ্কশেখর দত্ত ভিন্নরাজ্যের বাসিন্দা। ক্বচিৎ দেখা মেলে। চিঠিপত্রে দূরভাষে যেটুকু সংযোগ। অপর্ণা মজুমদার বর্তমানে অপর্ণা ভট্টাচার্য হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আনন্দময় ভট্টাচার্যের স্ত্রী ছিলেন। অরবিন্দ কর জলপাইগুড়ি থেকে 'কিরাতভূমি' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করত। আর অজিত কুমার ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালে অজিতেশ ভট্টাচার্য) 'মধুপণী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যথেষ্ট খ্যতিমান ছিল। আর যারা ছিল তাদের মধ্যে শান্তি চক্রবর্তী, সুখেন্দু দাস, দেবতোষ সেনগুপ্ত, সতী দাম, দীপ্তি জোয়ারদার, তৃপ্তি জোয়ারদার, মুক্তা ঘোষ কেউই আর সাহিত্যের আঙিনায় পা রাখেনি। তবে সেই দিনগুলোতে 'সংযোগ'-এর প্রচার ও বিপণনে এদের ভূমিকা উপেক্ষণীয় ছিল না। বলতে গেলে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর ব্যাপারে এরা প্রভূত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে গেছে।

'সংযোগ'-এর কার্যালয় ছিল হিলকার্ট রোডে অবস্থিত শ্রীভবনের দোতলায়। এই অফিসঘরটি আমরা বিনা ভাড়ায় পেয়েছিলাম সদাশয় কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্যের বদান্যতায়। তিনি আমাদের অনেক আবদার অনুরোধ বিনা বাক্যব্যয়ে রক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি মানুষের কথা মনে পড়ে। তাঁর নাম কালী ধর। জাতীয় সমবায় ভাণ্ডার প্রেসে আমাদের সংযোগ পত্রিকা ছাপা হত। পত্রিকা প্রকাশের আগের রাত আমাদের বিনিদ্র কাটত। কালীধর আমাদের উৎসাহ দিতেন। কাছেই হিলকার্ট রোডে 'বিরাট সিঙাড়া'র দোকান ছিল। সেখান থেকে 'বিরাট সিঙাড়া' আসত, চা আসত। প্রায়ই দাম মেটাতেন তিনি।

'সংযোগ' কেবলমাত্র একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকাই ছিল না, সেই সময়কার শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হত মূলত এই পত্রিকাকে ঘিরেই। 'সংযোগ'-এর উদ্যোগে এই শহরে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। মেঘদূত হলে সাড়ম্বরে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করেছি আমরাই। সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার প্রথা এখানে আমরাই প্রথম প্রবর্তন করি। 'সংযোগ'-এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগেকে। মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। তেনজিং, এভারেস্ট জয় করে ঘরে ফেরার পথে শিলিগুড়িতে এলেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে বরণ করে আনা হল। তিলক ময়দানে (এখন যেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন) বিশাল জনসমাবেশে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হল। বিভিন্ন সংস্থা থেকে মানপত্র ও পুষ্পস্তবক ভুলে দেওয়া হল তাঁর হাতে। 'সংযোগ'-এর পক্ষ থেকে যে মানপত্র দেওয়া হয়েছিল সেটি আমারই রচনা। পড়েওছিলাম আমি। তাতে এভারেস্ট শৃঙ্গকে কল্পনা করা হয়েছিল প্রতীক্ষারতা নিদ্রিতা নিঃসঙ্গ রূপসী এক নারী রূপে। রূপকথায় যেমন করে রাজপুত্র তার পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে রাক্ষসপুরীর বন্দিদশা থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে, তেনজিংও তেমনি এভারেস্ট নামের সেই তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে প্রতীক্ষারতা নিদ্রিতা প্রেয়সীকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার কোমল স্পর্শ দিয়ে। সেই মানপত্রটিতে যতই নতুনত্ব থাক, প্রবীণরা মনে মনে প্রচণ্ড খেপেছিলেন। বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন তাঁরা।

পাঁচের দশকের আগে পর্যন্ত শিলিগুড়ি তথা সমতল দার্জিলিং জেলায় বাংলা সাহিত্যে-চর্চার ক্ষেত্রটি ছিল নিতান্তই অনুর্বর। অথচ নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল সেই দ্বিতীয় দশক থেকেই। শহরের প্রীচানতম সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান মিত্র সম্মিলনীর উদ্যোগে এই শহরে নাট্যভিনয়ের যে রকম ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, সেরকম কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা যায় নি। মিত্র সম্মিলনীর সদস্যরা নাট্যাভিনয়কেই সংস্কৃতি চর্চার একমাত্র মাধ্যম বলে মনে করতেন। সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করবার আগ্রহ তাদের ছিল না।

সঙ্গীত-চর্চায়ও শিলিগুড়ি তখন পিছিয়ে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী শহর জলপাইগুড়ির সঙ্গে তুলনা করলে এই পশ্চাদ্‌গামিতা স্পষ্টতই চোখে পড়ত। জলপাইগুড়ি তখন বনেদি শহর। নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত, সাহিত্য সবদিক থেকেই জলপাইগুড়ি তখন কয়েকধাপ এগিয়ে। আমি যখন শিলিগুড়িতে আসি সেই পাঁচের দশকের প্রথম দিকে জলপাইগুড়ি শহরের প্রতি আমারও একটা সম্ভ্রমবোধ ছিল।

কিন্তু পঞ্চাশের পর থেকে ওপার বাংলার মানুষের ভিড়ে অতি দ্রুত শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক জীবন বদলে যেতে

থাকে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিও ঘটতে থাকে দ্রুত তালে। পত্রপত্রিকা প্রকাশের ধুম পড়ে যায়। 'সংযোগ'-এর সমকালেই বিমল ঘোষের ('চোমংলামা' ছদ্মনামে লিখতেন) সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা 'শতাব্দী' আত্মপ্রকাশ করে। বিমল ঘোষ তখন সুপ্রতিষ্ঠ গল্পকার। লিখতেন বিমল কুমার ঘোষ নামে। কলকাতার নামী-দামী পত্রপত্রিকায় তাঁর গল্প ছাপা হচ্ছিল। মাসিক বর্তমান, সত্যযুগ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, বঙ্গশ্রী, পূর্বাশা ইত্যাদি কাগজে নিয়মিত রোমান্টিক গল্প লিখতেন তিনি। বিমল ঘোষ আমার অগ্রজপ্রতিম। কিন্তু প্রায় আকস্মিকভাবেই তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তখন আমি ভারতমগরের বাসিন্দা। যে বাড়িতে থাকতাম, সেই একই বাড়ির পাশাপাশি ঘরে থেকেছি। বিধবা মা ও এক ভাই নিয়ে তাঁর সংসার। চাকরি করতেন শিলিগুড়ি বাস সিন্ডিকেটে। শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি ও শিলিগুড়ি-খড়িবাড়ি রুটে টাইম-কিপারের কাজ। তাঁর কর্মস্থলে দু'একবার গিয়েছি। তাঁর সঙ্গে সবসময় সাহিত্য বিষয়ে আলোচনাও হত। আমি তখন লেখক জগতে একেবারেই নভিস'। কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক কোনো অভিধায়ই আমাকে অভিহিত করা যেত না, তবে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। তখন 'বাঁধনহারা ছদ্মনামে লিখতাম। সে-সব লেখা আদৌ কবিতাপদবাচ্য হত না সেটা এখন বুঝি। কিন্তু বিমল ঘোষ তখন কলকাতায় লেখকসমাজে সুপরিচিত গল্পকার। আমার তখন প্রস্তুতিপর্ব, আর বিমল ঘোষ লব্ধ প্রতিষ্ঠ। দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একাত্ম হতে পেরেছিলাম শুধুমাত্র সাহিত্যপ্রীতির কারণে।

বাস সিন্ডিকেটের চাকরি ছেড়ে বিমলবাবু একসময় চা-বাগানে চাকরি নিয়ে চলে যান। এতকাল যিনি কল্পনার জগৎ থেকে তার লেখার উপকরণ সংগ্রহ করতেন, তিনি এবার বাস্তবের মুখোমুখি হলেন। তাঁর লেখায় এলো উত্তরবঙ্গের বাস্তব পটভূমি। চা-বাগানের কুলি-কামিন, গ্রামাঞ্চলের দেহাতি মানুষজন তাদের জীবনযাত্রা, ভাষা-ব্যবহার সব কিছু নিয়ে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল তার গল্প-উপন্যাসে।

মনে পড়ে, তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়ি। এক উঠতি সিনেমা প্রযোজকের সঙ্গে আলাপ হয়। সেই আলাপের সুত্র ধরে মাঝে-মধ্যে স্টুডিও পাড়ায় যাতায়াত। শুটিং দেখা। এমন হতে হতে একদিন বিমলবাবুর চা-বাগানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস 'এক পেয়ালা চা-এর পাণ্ডুলিপি হাতে এলো। দেখলেন সেই প্রযোজক মশাই। ইচ্ছে প্রকাশ করলেন সিনেমা করবেন। তৈরি করে ফেলেন স্ক্রিপ্ট। কোথায় কোথায় শুটিং, হবে সে-বিষয়েও আলোচনা হল দু'জনের মধ্যে। কিন্তু হা হতোস্মি। প্রযোজকের প্রথম ছবি 'ফ্লপ' করায় তিনি আর উৎসাহ দেখালেন না। পাণ্ডুলিপি ফেরত নিয়ে জমা দিয়েছিলাম এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানির কাছে বিমলবাবুর নির্দেশেই। দীর্ঘদিন ফেলে রেখে তারাও ফেরত দিল। অবশেষে এই 'এক পেয়ালা চা'-এর নাম বদল করেই রিমলবাবু প্রকাশ করলেন 'পাতার নাম জনম' উপন্যাস।

বিমলবাবুর সঙ্গে আমার সম্প্রীতির বন্ধন তখন অটুট। আলিপুরদয়ারে যখন ছিলাম তখনও চিঠিপত্রে যোগযোগ ছিল। ওই সময় ওঁর 'চোমংলামার চোখে উত্তরবঙ্গ' ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছিল সাপ্তাহিক বসুমতীতে। পরে ১৯৬৭-তে বই আকারে প্রকাশিত হয়। বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। সেই সময় থেকেই 'বিমলকুমার ঘোষ' নিজের পিতৃদত্ত নাম পরিত্যাগ করে 'চোমং লামা' ছদ্মনাম ধারণ করেন। এখানো পাঠককুল তাঁকে তাঁর স্বনামে কমই চেনেন।

১৯৫৪-তে শিলিগুড়ি কলেজের পাট চুকিয়ে-যখন জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়তে গেলাম তখন সেখানে সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলাম দেবেশ রায়কে। দেবেশের মধ্যে বরাবরই একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করেছি। মেধাবী ছাত্র হয়েও পরীক্ষায় ভালো ফল করার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহই ছিল না। প্রতিযোগিতার দৌড়ে অংশ নেওয়া হয়তো তার অপছন্দ ছিল। কিন্তু তার মধ্যে যা ছিল তা আমাদের কারুর মধ্যেই ছিল না। ভালো ছাত্র না হয়ে ভালো লেখক হবার অনলসসাধনা ছিল তার। প্রতিভাও ছিল। সে প্রতিভার উজ্জ্বল অভিপ্রকাশ ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীনই। তার গল্প বেরোতে শুরু করল 'দেশ' পত্রিকায়। আজকাল 'দেশ'-এ বহু নবীন গল্পকারের গল্প ছাপা হয়। কিন্তু সাড়া-জাগানো গল্প তেমন চোখে পড়ে না। অথচ সেই সময় দেবেশ রায় বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো গল্প লিখেছিল। এ যেন এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। একদিন ক্লাশের মধ্যেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ওর গল্পের প্রশংসা করেছিলেন। যে কোনো কারণেই হোক এক সময় 'দেশ'-এর সঙ্গে দেবেশের বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কী আসে যায়। দেবেশ তখন সাহিত্যক্ষেত্রে রীতিমত প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত।

উনিশশো আটান্নতে এম.এ. পাশ করে দেবেশ জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করে কলকাতা চলে যায়। আমি তখন আলিপুরদুয়ার কলেজে পড়াচ্ছি। তারপর আর ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেনি। মাঝে-মধ্যে হয়তো এক আধবার কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবেশ আমার কাছে দূর আকাশের নক্ষত্র হয়েই রয়ে গেছে এখন পর্যন্ত।

বরং কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের (আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী)সঙ্গে আমার একটা হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দেবেশ চলে যাবার পর অমিতাভ জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করতে আসে। সেই সূত্রে আমরা আবার কাছাকাছি আসি। সুকবি, সুবক্তা এবং দৃঢ়চেতা অমিতাভ আজ আর বেঁচে নেই।

পাঁচের দশককে আমার জীবন-প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্ব বলা যেতে পারে। উনিশশো পঞ্চাশের গোড়া থেকে ষাটের প্রায় শেষাশেষি পর্যন্ত আমার জীবনে পরপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনা, উৎসাহ-নিরুৎসাহে আন্দোলিত সে-সব ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে যে-টুকু লেখালেখি করতাম তাতে নিজেকে একজন লেখক বলে মনে হত না। কবিতা-গল্প সবই লিখেছি। কিন্তু তাতে সারবস্তু কতটুকু থাকত সে বিষয়ে তখন আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটেনি। একালে দেখা যায়, যা-খুশি লিখেও নিজেকে লেখক বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন অধিকাংশ 'নবিশ' কবি ও গল্পকার। আসলে কবিতা কী জিনিস, ছোটগল্প কাকে বলে এ বোধ না জন্মালে কখনও কবি বা গল্পকার হওয়া যায় না। লেখক হতে গেলে নিজের লেখার সমালোচক হতে হবে সবার আগে। আত্মসমালোচনাই একজন লেখককে পথ দেখাতে পারে বড় হবার। তবে এমন একটা বয়স থাকে, যখন নিজের সৃষ্টিকে মায়ামুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিণত বয়সেও যদি সেই মোহমুগ্ধতা না কাটে, নিজের সৃষ্টির যথাযথ মূল্যায়ন করার ক্ষমতা না জন্মায় তা হলে তার পক্ষে লেখক হয়ে ওঠা কোনমতেই সম্ভব নয়। গল্প লেখা দিয়ে আমার সাহিত্যে হাতেখড়ি। কাবিতাও একসময় দু'চারটে লিখেছি। এ বয়সেও গল্প-কবিতা দুইই লেখার চেষ্টা যে করিনি তা নয়। কিন্তু আমি স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছি ও দুটো আমার জন্য নয়। কবি বা গল্পকার হওয়া আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।

অথচ আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, একালের অধিকাংশ কবিযশপ্রার্থী তরুণ-তরুণী কবিতার অবয়বে যা রচনা করেন তা যে আদতে কবিতা হয়ে ওঠে না সে বোধটুকুও তাদের নেই। যথার্থ কবিতা কী জিনিস, সত্যিকারের ছোটগল্প কাকে বলে আগে সেটা জানতে হবে। উত্তরবঙ্গে ভালো গল্পকার বা কবির সংখ্যা নগণ্য। যাঁরা একটু প্রতিষ্ঠা পান তাঁরা আর উত্তরবঙ্গে থাকেন না, কলকাতাবাসী হয়ে যান বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার জন্য। এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম অমিয়ভূষণ মজুমদার। প্রয়াত অমিয়ভূষণ উত্তরবঙ্গের মাটিতেই আজীবন বসবাস করে নিজেকে তৈরি করেছিলেন। বহুপঠনশীল পরিশ্রমী লেখক ছিলেন তিনি। নিজেকে বিদগ্ধ লেখক হিসেবেই পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের ভাই প্রয়াত অশণিভূষণ মজুমদারও চমৎকার গল্প লিখতেন। ছয়ের দশকে আলিপুরদুয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি আজ বিস্মৃতির অন্তরালে।

আমার লেখক-জীবনের একটা সুনির্দিষ্ট পথরেখা তৈরি-হয়েছিল আলিপুরদুয়ার কলেজে অধ্যাপনাকালে। বরাবরই আমার মধ্যে একধরনের ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকপ্রবণতা ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট, সামাজিক অসাম্য, পারিবারিক নিঃস্বতা, ব্যক্তিগত সংগ্রাম সবকিছু মিলিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমার কৈশোর-যৌবন অতিবাহিত হয়েছে যে, আমার ভেতরে অবিমিশ্র রোমান্টিক চেতনা ওই বয়সে শেকড় গাড়তে পারে নি। উনিশশো ষাটে যখন আলিপুরদুয়ার কলেজে চাকরি পেলাম, তখন একটা স্থায়ী জীবিকার আশ্বাস পেয়ে আমার লেখালেখির ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিল পরম উৎসাহে। কিন্তু আমার লেখায় সেই কৌতুকরস, সেই ব্যঙ্গবিদ্রুপের ছোঁয়া এবারে যেন বেশিমাত্রায় প্রাধান্য পেল। লিখলাম ছোটদের জন্য ছড়া, লোককথা। বড়দের জন্য ব্যঙ্গধর্মী রসরচনা। এখানে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম কবি বেণু দত্তরায়কে (সুরঞ্জন দত্তরায়)। তাঁরই অনুপ্রেরণায় এবং তরুণকুমার ভট্টাচার্য, অনিল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কয়েকজনের সহযোগিতায় বের করলাম 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। আমি ছিলাম প্রধান সম্পাদক। বাকিরা সম্পাদক। সাল উনিশশো বাষট্টি। পাঁচটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিল। তারপর একদিন দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। ওই পাঁচটি সংখ্যায় আমি মোট পাঁচটি গল্প লিখেছিলাম। তার মধ্যে চারটি গল্পই কৌতুকরসাশ্রিত। এই সময় অচলপত্র সচিত্রভারত, ষষ্টিমধু, সিনেমাজগৎ ইত্যাদি পত্রিকায় আমার কয়েকটি রম্যরচনা প্রকাশিত হয়। স্বনামে নয়, 'শ্রীদাম' ছদ্মনামে। রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — অধ্যাপক (বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' প্রবন্ধের প্যারডি), স্বর্গে শিশুবিদ্রোহ, পতিদেবতার স্ত্রীরূপ দর্শন (গীতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের অনুসরণে), অর্থ তৈল সংবাদ, লাখ টাকা হাতে পেলে। আলিপুরদুয়ারে থাকাকালীন লিখেছিলাম 'সৌদর বনে ভোঁদড় রাজা', ছোটদের জন্য ছড়ার মাধ্যমে গল্প। যেটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় কলকাতার যোগমায়া প্রকাশনী থেকে।

আলিপুরদুয়ারে সেইসময় যাঁরা সাহিত্য চর্চা করতেন তাদের মধ্যে জগন্নাথ বিশ্বাস, বেণু দত্তরায়, শক্তিপদ ঘোষ, বঙ্কিম মাহাত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন একাধারে কবি ও গবেষক। বেণু দত্তরায় সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'অগ্নিবর্গ' ছদ্মনামে ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন 'তিমির প্রান্তর ডুয়ার্স'। তাঁর গবেষণার বিষয়

'ব্যঙ্গসাহিত্য ও ব্যঙ্গকার ভারতচন্দ্র'। শুনেছিলাম জগন্নাথ বিশ্বাস একখানি বিপুলায়তন প্রাণীকোষ সংকলনে হাত দিয়েছিলেন। সে কাজ অঙ্কুরেই পরিত্যক্ত হওয়ায় সাধারণের গোচরে আসেনি। সমীর চক্রবর্তী গবেষণা করেছেন চা-বাগানে কর্মরত আদিবাসী মানুষদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে। তাঁর গবেষণাগ্রন্থের নাম 'উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি। অর্ণব সেন একাধারে গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। অনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের পেশা আইন ব্যবসা, নেশা সাহিত্য। তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটি একবার উন্মোচন করলে তা থেকে মজাদার টুকরো টুকরো অজস্র ঘটনা বেরিয়ে আসত। আমাদের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' পত্রিকায় সেইসব ঘটনা নিয়ে বৈঠকি ঢঙে, তিনি ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন 'ডুয়ার্স প্রাঙ্গণ থেকে। পরে সেটি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়। শক্তি ঘোষ ও বঙ্কিম মাহাতর উদ্যোগে বেরিয়েছিল' এই শতক পাক্ষিক পত্রিকা। আমিও যুক্ত ছিলাম তার সঙ্গে। পত্রিকাটি স্বল্পকাল জীবিত ছিল। সম্পাদনা করতেন বঙ্কিম মাহাত। সহ-সম্পাদক আশিস সেনগুপ্ত ও সৌমেন বসু।

আলিপুরদুয়ারে থাকাকালীন আমি একটি গবেষণা-কাজে হাত দেই। ড. ভবানীগোপাল সান্যাল (যিনি আনন্দচন্দ্র কলেজে আমার অধ্যাপক ছিলেন, পরে সরকারি কলেজে চাকুরি নিয়ে চলে যান) তখন ভিক্টোরিয়া কলেজের (পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ) অধ্যাপক। তাঁরই তত্ত্বাবধানে শুরু করেছিলাম উপজাতির সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা গ্ধ সমীক্ষার মাধ্যমে কাজটা অনেকদূর এগিয়েও অসমাপ্ত যায়। শেষের দিকে ড. নীহাররঞ্জন রায়ও নানান পরামর্শ নিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ এই কাজ আনাকে মাঝপথে পরিত্যাগ করতে হল। এরপর অধ্যাপক ভরণীকান্ত ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় নতুন একটি কাজে হাত দিয়ে ফেললাম। কোচবিহার রাজসভার কবি পীতাম্বর রচিত ভাগবত দশম স্কন্ধের পুথি সম্পাদনা। এই গবেষণা-কাজের মূল তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. হরিপদ চক্রবর্তী। এই কাজের জন্যই উনিশশো চুয়াত্তরে আমার পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি প্রপ্তি ।

দশটি বছর আলিপুরদুয়ারে কাটিয়ে উনিশশো সত্তরের জানুয়ারিতে ফের শিলিগুড়ি চলে এলাম। গোটা ছয়ের দশক আমি শিলিগুড়ির বাইরে ছিলাম। কী কারণে জানি না, এই ছয়ের দশকে শিলিগুড়ি বা তার আশপাশের কোনো অঞ্চলেই সাহিত্যচর্চার তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। পাঁচের দশকে যে-কটি পত্রপত্রিকা বেরিয়েছিল তার কোনটিই ছয়ের দশক পর্যন্ত টিকে থাকেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম অরবিন্দ করের 'সৈকত'। ''সৈকত' বেশ কিছুকাল টিকেছিল। এই ''সৈকত'কে কেন্দ্র করে অরবিন্দ কর মোটামুটি একটা সাহিত্যিক পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। আমিও তার সামিল হয়েছিলাম। দু'একটা লেখাও লিখেছিলাম। তবে ঠিক মনে করতে পারছি না কী লিখেছিলাম। ''সৈকত' মোটামুটি একটা পরিচ্ছন্ন কাগজ ছিল। লেখার মানও খারাপ ছিল না।

সাতের দশকে এসে শিলিগুড়িতে আবার সাহিত্য-চর্চার একটা জোয়ার দেখা দেয়। বস্তুত সাত এবং আট এই দুই দশকেই শিলিগুড়ি মহকুমায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকাকে ঘিরে বিপুল উদ্দীপনায় বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন হয়েছে। এই দুই দশকে প্রান্তরেখা, যুবচিন্তা, ঝিনুক, গদ্য পদ্য এবং, যুদ্ধক্ষেত্র, পাহাড়তলী, বালুকা, ধৃতরাষ্ট্র, কথাশিল্প, উত্তরধ্বনি, ছান্দোগ্য, এইসময়, ক্রৌঞ্চী, বালাসন, শব্দচেতনা, নবজাতক, আসমুদ্র হিমাচল, সাম্প্রত, হিমাচলবার্তা, সানুদেশ, সত্তা, চমচম (ছোটদের পত্রিকা) ইত্যাদি বহু পত্রিকা বেরিয়েছিল এখান থেকে। এর মধ্যে দু'একট পত্রিকা

এখনও টিকে আছে। বীরেন চন্দ-সম্পাদিত 'উত্তরধ্বনি' অনিয়মিত হলেও বিশেষ সংখ্যা হিসেবে মাঝেমাঝেই আত্মপ্রকাশ করে। ষষ্ঠী বাগচী এককভাবে বালাসনের কয়েকটি সংখ্যা বের করেছিল নয়ের দশকের শেষ অবদি। কল্যাণ দে'র 'ক্রৌঞ্চী' বিধাননগর থেকে প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রয়াত রঞ্জন বিশ্বাস-প্রবর্তিত 'কথাশিল্প' ও 'যুদ্ধক্ষেত্র' পুনঃ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রাণ চক্রবর্তী। তাঁর উদ্যোগে ও হরেন ঘোষের ঐকান্তিক সহযোগিতায় পত্রিকাদুটি আবার প্রকাশিত হয়। উদ্যোক্তা দুজনেই প্রয়াত ।

শুধু শিলিগুড়িতে কেন, সারা উত্তরবঙ্গে সাত ও আটের দশকে প্রচুর পত্রপত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কোচবিহার জেলা থেকে বাল্মীকি, অন্যস্বর, মেঘনা,আকাশ, সরীসৃপ, তমসুক, ঋষ্যমুক, ময়ুখ, কোচবিহার সাহিত্যসভা পত্রিকা, টিনটিন (ছোটদের পত্রিকা), জলপাইগুড়ি থেকে উত্তরদেশ, জলার্ক, ডানপিঠেদের আসর (ছোটদের), কর্ণিক, সৌরশিখা, বনভূমি, কোরাস, যাত্রিক, তল্লাসী, গল্প ইদানীং, উত্তরের হাওয়া, উত্তরবাংলার চিঠি, লাল নক্ষত্র, অবিভক্ত দিনাজপুর থেকে দধীচি, পাঞ্চজন্য, চেতনা, দিশারী, অশোকবন, প্রতিলিপি, বিবর্ণ মুখোস, সূর্যবীজ, বাড়বাগ্নি, কিছু কথা, উদীরণ, মধুপর্ণী, মালদহ থেকে জোয়ার, উত্তরমেঘ, উত্তরদিগন্ত, তিস্তা থেকে গঙ্গা ইত্যাদি অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এইসব পত্রপত্রিকাকে আশ্রয় করে উত্তরবঙ্গের মাটিতে সাহিত্যচর্চার যে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কোনো কোনোটির সঙ্গে লেখার সূত্রে সম্পর্কযুক্ত হয় পড়েছিলাম।

মোটকথা, উত্তরবঙ্গের সর্বত্র এই সাহিত্যচর্চার উদ্দীপনা আমাকেও সেইসময় উদ্দীপিত করেছিল। তাই আলিপুরদুয়ার থেকে এখানে এসেই প্রদ্যোত সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কিছু করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সঙ্গে পেয়েছিলাম নীরেন রায়কে। তখন মিনি পত্রিকা মিনি গল্প এসব প্রকাশের একটা হুজুগ চলছিল। আমরাও বের করলাম মিনি পত্রিকা 'অনুবীক্ষণ'। কয়েকটি সংখ্যা বেরুবার পর কী কারণে যেন বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময় ষষ্ঠী বাগচী, রমেন রায়, ভূপেন কুন্ডু প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী শিক্ষকের অদম্য উৎসাহে 'বালাসন' নামে একখানি ক্ষীণকায় পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রকাশনা-দপ্তর ছিল কলেজ রোডে অবস্থিত 'বুক সোসাইটি' নামে একটি বইয়ের দোকানে। বুক সোসাইটির কর্ণধার গান্ধীবাবু (অহিভূষণ চক্রবর্তী) এবং তাঁর ভাই বিধুবাবুও (বিধুভূষণ চক্রবর্তী) ছিলেন এই বালাসন-গোষ্ঠীর সদস্য। যতদুর মনে পড়ে বিধুবাবু ছিলেন 'বালাসন'-এর প্রকাশক। গান্ধীবাবুর বইয়ের দোকানে প্রতি সন্ধ্যায় একটি নির্ভেজাল সাহিত্যিক আড্ডা বসত। সেখানে তখনকার 'বালাসন'-গোষ্ঠী ছাড়াও আরও অনেকে নিয়মিত আসতেন। আমিও যেতাম। সান্ধ্য বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হরেন ঘোষও কলেজ ছুটির পরে রোজ রাতে সেখানে হাজির হতেন। আসতেন কবি নির্মল চক্রবর্তী। আর এইভাবে 'বালাসন' পত্রিকার সঙ্গে আমি ও হরেনবাবু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। আমার ও ষষ্ঠী বাগচীর যুগ্ম সম্পাদনায় 'বালাসন'-এর অনেকগুলি সংখ্যা বেরিয়েছিল। ভালো ভালো লেখাও ছাপা হয়েছে এতে। সত্যিকথা বলতে কি আমার অনেকগুলি ভালো প্রবন্ধ 'বালাসন'-এই ছাপা হয়। 'বালাসন'-ই আমাকে প্রবন্ধ লেখায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। বেশ কিছুকাল নিয়মিত প্রকাশনার পর শারীরিক কারণে আমাকে 'বালাসন' থেকে সরে আসতে হয়। সরে আসেন

হরেনবাবুও। কিন্তু তাতে 'বালাসন'-এর প্রকাশ বন্ধ হয় নি। ষষ্ঠী বাগচীর একক প্রয়াসে এর প্রবহমাণতা অক্ষুণ্ণ ছিল অনেক কাল।

উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে আকাশবাণীর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আমি আলিপুরদুয়ারে থাকাকালীনই শিলিগুড়িতে আকাশবাণীর একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। আমি শিলিগুড়িতে ফিরে আসার পরপরই কথক (talker) হিসেবে আকাশবাণীর তালিকাভুক্ত হই। প্রথম দিকে ভারি প্রবন্ধ, পরে 'চিত্রবিচিত্র' নামের অনুষ্ঠানটি চালু হলে আমাকে রম্যরচনা লিখতে এবং পড়তে হত। তখন এই বিভাগটির দায়িত্ব ছিল প্রোডিউসার অসীম রেজের উপর। আর কেন্দ্র-অধিকর্তা ছিলেন সুগায়ক সঙ্গীতজ্ঞ অমলেন্দু বিশ্বাস করচৌধুরী। সেইসময় আকাশবাণী নেহাতই একটা সরকারি দপ্তর ছিলনা। সাহিত্য-সঙ্গীত-নাট্য-শিশুমহল সব মিলিয়ে জমজমাট আসর। আমরা রেকর্ডিং করাতে যেতাম, আর ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডায় মেতে উঠতাম। সে আড্ডায় অসীম রেজ বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় (দেবু), শ্রীপদ দাস এবং আরও দু'একজনকে পেতাম। অসীম রেজ ভালো গল্প লিখত। বেশির ভাগই মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। তাতে গল্প প্রায় থাকতই না। শুধু কথার মায়াজালে চরিত্রের উন্মোচন হত। অসীম ছবি নিয়ে পড়াশোনা করত। বিশেষকরে পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পী সম্পর্কে তারা বিচার বিশ্লেষণ গতানুগতিক ধারা থেকে অন্যরকম। অসীম প্রায় প্রত্যেক রবিবার আমার বাড়িতে আসত। অনেক গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। অসীম চলে যাবার পর সাহিত্যের একটা বিশুদ্ধ আড্ডা বন্ধ হয়ে যায়।

আমি শিলিগুড়িতে পা রাখার আগে যে-সব পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল তার মধ্যে 'মহানন্দা' ও সাপ্তাহিক 'শিলিগুড়ি পত্রিকা'র কথা বলেছি। ১৯৫১-তে আর একটা পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল সুধীর কুমার বিশ্বাস সাহিত্য সরস্বতীর সম্পাদনায়। পত্রিকাটির নাম 'উত্তর বাংলা'। প্রথমে মাসিক পরে সাপ্তাহিক। মাসিক 'উত্তর বাংলা'য় অনেক উন্নতমানের লেখা প্রকাশ পেত। ডা.চারুচন্দ্র সান্যালের টোটোদের সম্পর্কে লেখা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'টোটোদের কথা' ছাপা হয়েছিল এই 'উত্তরবাংলা' পত্রিকাতেই। পরবর্তীকালে সুধীর কুমার বিশ্বাসের পুত্র স্বপনকুমার বিশ্বাস পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নেন। তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘকাল পত্রিকাটি নিয়মিত বের হতে থাকে। স্বপন বিশ্বাসের আকস্মিক প্রয়াণের পর স্বপনের স্ত্রী শ্রীমতী অনীতা বিশ্বাস পত্রিকাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'উত্তরবাংলা' এখনো চলছে।

১৯৫৫তে বেরিয়েছিল 'শ্রীদুর্মুখ'। সম্পাদক ছিলেন ডা. বিনয় মজুমদার। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন সুধীর কুমার বিশ্বাস সাহিত্য সরস্বতী।

উত্তরবঙ্গে সাহিত্যিক তৈরির ক্ষেত্রে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর কৃতিত্বও কম নয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদে তখন কঙ্কন নন্দী, রথীন রায়, মনোজ রাউত, শ্যামল চৌধুরী পরম উৎসাহে কাজ করছে। 'রবিবারের সাময়িকী' ও 'শিশু কিশোর 'আসর'-এ ভালো ভালো লেখা ছাপা হচ্ছে। 'শিক্ষাদীক্ষা'র পাতাও সুসম্পাদিত। অনেক লিখেছি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'এ। নানা ধরনের লেখা। পরে নয়ের দশকের গোড়ায় 'দৈনিক বসুমতী' শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হতে থাকলে কঙ্কন নন্দী, রামসিংহাসন মাহাত, প্রমুখ কয়েকজন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ছেড়ে 'বসুমতী'তে যোগ দেয়। কঙ্কনের অনুরোধে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ছেড়ে বসুমতীতে লেখা শুরু করি। সে-ও কমদিন হল না। কঙ্কন মূলত গল্পকার ও কবি। সংবাদপত্রে কাজ করতে গিয়ে তাকে ভিন্নধর্মী লেখাও লিখতে হয়,তাগাদা দিয়ে লেখাতে হয়। এক কথায় লেখা এবং লেখক তৈরী দুটো কাজেই সে সব্যসাচী।

হরেন ঘোষ, বিমল ঘোষ (চোমং লামা), নির্মল চক্রবর্তী, দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস, সরিৎ তোকদার, সুরঞ্জন দত্তরায় (বেণু দত্তরায়) প্রমুখ কয়েকজনের অতীব উৎসাহে সারা উত্তরবঙ্গের সব লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যানুরাগীদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপকার হলেন সরিৎ তোকদার, যিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁরই ঐকান্তিক প্রয়াসে ১৯৮৬-র ৩০ এপ্রিল জন্ম নেয় 'উত্তরবঙ্গ লেখক সমবায় সমিতি লিমিটেড'। প্রথম দিকে সবারই যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। 'উত্তরবঙ্গের নির্বাচিত গল্প' নামে উত্তরবঙ্গের গল্পকারদের লেখা গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। পরে 'সাহিত্য-সুভাষিত অভিধান' নামে একটি উদ্ধৃতি-অভিধানও আমরা প্রকাশ করি । সমিতির একটি মুখপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। নাম ছিল 'সমানয়ন'। সম্পাদক পদে ছিলেন বিমল ঘোষ। আমি ছিলাম প্রকাশক। পরবর্তীকালে সংখ্যা-সম্পাদক হিসেবে আমি ও জ্যোতির্ময় দেবনাথ কাজ করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন, লেখালেখির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের সবাইকে একটা সাধারণ প্লাটফর্মে নিয়ে আসা। আমরা দু'বার উত্তরবঙ্গ লেখক সম্মেলন করেছি। সাহিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কারও দিয়েছি কয়েকজনকে।

কিন্তু হলে কী হয়। ধীরে ধীরে এইসব উৎসাহ উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে আসে। সদস্যরা ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে থাকেন। সব দায়-দায়িত্ব এসে পড়ে আমার ও হরেনবাবুর ওপর। ফলে এই সমিতি রুগ্ন শিল্পের মত সঙ্কটে ভুগছিল।

বাণিজ্যিক শহর হিসেবে শিলিগুড়ির দুর্নাম অবিসংবাদিত। তবে ছয়ের দশকের আগ পর্যন্ত শহর এতটা বাণিজ্যমুখী হয়ে ওঠেনি। তখন মানুষে মানুষে ভাব ছিল, দু'দণ্ড বসে সুখ-দুঃখের কথা বলার অবকাশ ছিল, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তেমনভাবে গড়ে না উঠলেও চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা, পাড়ায় পাড়ায় সামাজিক গোষ্ঠীবদ্ধতা ছিল, পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ছিল, রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ তখনও মাথা চাড়া দেয় নি, সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠেনি তখন পর্যন্ত এই শহর। কিন্তু দশ বছর বাইরে থাকার পর যখন শিলিগুড়িতে ফিরে এলাম তখন দেখলাম শহরের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। মানুষ ছুটছে টাকার পেছনে। এক মুহূর্ত থামবার অবকাশ নেই। বিলাস-বৈভব ছিনিয়ে নেবার প্রতিযোগিতায় সবাই দৌঁড়াচ্ছে। সৎ-অসৎ যে কোনো উপায়েই হোক অর্থোপার্জনই একমাত্র লক্ষ্য। এক কথায় শিলিগুড়ি শহরের চরিত্রটাই তখন আমার কাছে নতুন ঠেকল।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মানবজমিন' উপন্যাসে এই সময়কার শিলিগুড়ি শহরের বাস্তব চেহারাটি মেজদা দীপনাথকে লেখা প্রীতমের একটি চিঠিতে সামান্য কথায় চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, - ''আমি ভাল আছি। কিন্তু এ জায়গাটা কী বিচ্ছিরি হয়ে গেছে বলো তো? মদের দোকান, স্মাগলিং, মারপিট, হই-চই। আগে জানলে কিছুতেই আসতাম না। তুমি কখনো বলো নি তো আমাকে।... বলো তো, গোটা দেশে একটাও কি শান্ত, নিরিবিলি সুন্দর জায়গা

নেই। সব পচে গেছে। সব নষ্ট হয়ে গেছে? বেঁচে থেকে তবে আর কী হবে? কানাডায় এতকাল বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত ভেবেছি, আমার স্বপ্নের শিলিগুড়ি বুঝি গাছপালা পাহাড়-নদী আর নির্জনতা সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে আমার জন্য। কোথায় নদী? নোংরা হাটুরে চেহারার এই বিকট শহর আগাপাশতলা কলকাতার নকল।"

শীর্ষেন্দু কলকাতাবাসী হলেও শিলিগুড়িতে তাঁর পৈতৃক বাড়ি আছে। মাঝে-মাঝেই তাঁকে আসতে হয়। থাকতে হয়। প্রীতমের বকলমে তিনিই শিলিগুড়ির এই চরিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। বস্তুত শীর্ষেন্দুর দেখার মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। শিলিগুড়ি শহরের মানুষগুলির কলকাতার বাহ্যরূপটাকে অনুকরণ করবার দুর্বার প্রয়াস কারুরই চোখ এড়ায় না। কিন্তু যে কলকাতা সারা ভারতবর্ষে তথা ভারতের বাইরে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে পরিগণিত, সেই কলকাতাকে আত্মস্থ করবার ক্ষমতা তাঁদের দুরস্ত্। তাই এখান থেকে অনুষ্টুপ, প্রমা, বিভাব, কোরক, এক্ষণ, চতুরঙ্গ ইত্যাদির মত উন্নতমানের একটিও লিটল ম্যাগাজিন আজ পর্যন্ত বেরোয়নি। শক্তি, সুনীল, নীরেন চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, জয় গোস্বামী, কবিতা সিংহ, অরুণ মিত্র, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, জয়দেব বসুর মত একজন কবিরও কি সাক্ষাৎ মেলে? বিশ্বমানের না হোক, অন্তত মনকে নাড়া দেয় এমন গল্প-উপন্যাস কখানা লেখা হয়েছে এই শহরে? অথচ শিলিগুড়িকে বলা হয় উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী। বিগত পঞ্চাশ বছরে উত্তরবঙ্গের মাটিতে অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু যাঁরাই লেখালেখিতে কিঞ্চিৎ হাত পাকিয়েছেন তাঁরাই কলকাতার বাণিজ্যিক পত্রিকা বা লিটল ম্যাগের সামান্য দাক্ষিণ্য লাভের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যান। উত্তরবঙ্গে আজও গ্রন্থ প্রকাশনার পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। যদিও বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু'একখানি বই ছাপা হয়, তাও সুষ্ঠু বিপণন-ব্যবস্থার অভাবে মাঠে মারা যায়। এরকম পরিস্থিতিতে কোনোমতেই সত্যিকারের সাহিত্যিক-পরিবেশ তৈরি হতে পারে না। সৃষ্টির প্রেরণা নেই, শ্রমদানের অবকাশ নেই, অথচ লেখক হবার উদগ্র বাসনা আছে। বিগত পঞ্চাশ বছরে উত্তরবঙ্গের এই চেহারাটা আমাকে নিতান্তই পীড়িত করেছে। ■

সৌজন্যে ঃ উত্তরবাংলা পত্রিকা, শিলিগুড়ি

সাম্প্রতিক শিলিগুড়ির সৃজন-বৈচিত্র্য

এই বিভাগে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য সৃজনের পরিচয় তুলে ধরা হবে।

বাংলা

তুমি আছো।

পঙ্কজ ঘোষ

এখন কোনো অন্ধকার থাকতেই পারে না
যে - সব বৃহৎ অমাবস্যা আমাদের ভেতরে ছিল
সমস্তই বিচ্ছেদ নামক একটা সূক্ষ্ম জ্যোৎস্না দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছি

এখন আমরা বলতে কোনো সুন্দর নেই
এখন আমরা বলতে কোনো সরল নেই
এখন আমরা বলতে কোনো ছোট্ট ফুল নেই

শুধু এক প্রান্তে দুর্দান্ত আমি থাকি
আর দৃশ্যের বাইরে থাকা ওপর প্রান্তে তীব্র তুমি আছো।

ম্যানিকুইনের শহর

অনিমেষ

যাবতীয় সংলাপ অবদমিত হলে, উপেক্ষা পেয়ে ক্রমশ ঘরের দিকে টান পাচ্ছি। ফিরে তাকালেই দেখি টেবিলের ওপর আজও অপরিষ্কার তোয়ালে। ছবি ঢেকে গেছে, যে ছবির কাছে বসে থাকা যায়। তুমি তো জানোই মাঝরাতে আমি জেগে উঠে তোমাকে খুঁজি। পরপর ঘর বদলে যায়। ঘরের জানালা ছোট হয়ে আসে আরও। পাখি হাত বদল হয়। আমি বিছানা টেনে নিই আরও কাছে, রাত সবে কমিয়েছে তার দাপট। এবার ঘুমোবো, ঘুমের দরকার। শহরের জানালা কেউ বন্ধ করে দাও, ব্যথা উড়ছে বাতাসে...

কাঠেরা বৃক্ষ জন্মান্তর

স্বাগতা ঘোষ

মরা কাঠের চেয়েও মৃত
শহুরে কাঠ, চেয়ে আছি
চোখ আকাশ আজন্ম
পরিযায়ী পাখি
পাখিরা বৃক্ষ জানে
চেনে কাঠের কান্না মুখ
কাঠেরা বৃক্ষ জন্মান্তর বুঝি

গাছ শরীর বেয়ে লতানে চাঁদ
ক্ষেত সাপ হয়ে আসে
ফসলি জমিন যেন দুগ্ধবতী
মাঘী পূর্ণিমা রাতে

মানুষ তবু খুঁটে খায়
মানুষেরই শস্য ও শরীর
মানুষ তবু ঋণী, একাকী
গাছ ও মানুষেরই কাছে

মুখের ভাষা খারাপ

সৌরভ মজুমদার

একটি বুদ্ধিজীবী ছেলে-
এস এফ আই করতো।
গান গাইতো। হঠাৎ
একটি রূপসী মেয়ে,
তার প্রেমে পরলো।
সিম্পল ন্যারেটিভ।

ছেলেটা ভাবছে কালবেলা। মেয়েটা দেখছে অনিমেষ।
লেলিন, স্তালিন যথারীতি।

পথনাটক থেকে শিশু শ্রমিক।
চা বাগানে কিছু সূর্যাস্ত
পেরিয়ে,
ওরা ঠিক করলো
লড়াইগুলো একসাথে লড়বে।
শ্রেণিহীন স্বপ্নের লাল।
লাল সেলাম।

এখানে টুইস্ট রাখা দরকার।
ছেলেটি বিত্তশালী।
মেয়েটির হাতে টান।
সংসার নামের একটি সিনেমা বানাতে গিয়ে
শেষমেশ একটা শর্টফিল্ম দাঁড়ালো।

এখন ওরা একে ওপরের শ্রেণিশত্রু।
পাশাপাশি ঠিক, তবে বিপক্ষ সেজে লড়ে।
শ্রেণিহীন সকাল না আসলেও
ওদের সংসারে নেমেছে রাত।

মেয়েটির কলার বোনের কাছে চে গুয়েভারার
উল্কি।
কমরেড,জানল না-
ঠিক কোথায় চুমু খেতে হত।

আলোর উৎসধারা

শুভ্রদীপ রায়

সমকাল ডুবে আছে শুশ্রূষার মোহে। আমি দয়াপরবশ নই এ কথা কেউ বলতে পারবেনা। তোমার এই বিরল খারাপ লাগার দায় আমি মাথা পেতে নিলাম। এ আমার দয়া নয়,এ আমার জীবনকে বেছে নেওয়া। রোদছায়া মাখানো আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা হাতে হাত ধরেছিলাম-- সে বহুবছর আগের কথা। মাঝে অন্ধকার এসে ঢেকে দিতে চেয়েছিল আলোর উৎস। এখন দেখছি ধীরে ধীরে সোনালি রঙের আকাশ জানলার এদিক ওদিক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এতদিন জানতাম এই সংসারধর্ম আমার জন্য নয়। কিন্তু এখন তোমার পাশে বসে ওষুধ খাইয়ে দিতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। ভাল লাগে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে। সংঘাতের পরিসর পেরিয়ে এই যে আমাদের যৌথ আবাস,এরই নাম বুঝি সংসার!

আমি কোন অভিশপ্ত আগুনপুরুষ নই। অথচ আগুনে ভয় নেই আর। এ শহর থেকে সে শহর আমরা উপশম খুঁজে বেড়াই। একদিন ভোরে হাত ঠিকই ছুঁয়ে ফেলবে কাঙ্খিত বিশল্যকরণী।

একটি অতিপ্রাকৃত গল্প

■ শুভময় সরকার

।। ১ ।।

মেঘে ছেয়ে গেছে অনেকটা আকাশ তবে শেষবেলার ঝাঁঝাল রোদ খানিকটা ক্লান্ত হয়ে মেঘের নিচে চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এখন মেঘের রঙ কালচে লাল। বৃষ্টি হবে আজ। প্রস্তুতি চলছে।

রাত বাড়লে শব্দগুলো স্পষ্ট হয়ে আসে, জোরে মনে হয়। আজকাল আরও বেশি মনে হয়। মনে হয় তার কারণটা সহজ, রাতে চারপাশ বড় শব্দহীন।

ছেলেবেলায় দেখা সেই হরর মুভির কথা মনে পড়ে যায়, অরুণা টকিজে ওরা বন্ধুরা মিলে দেখতে গিয়েছিল। নিস্তব্ধ রাতে সেই অদ্ভুত ক্যাঁচ শব্দে দরজা খোলা এবং সেদিনই রজতাভ প্রথম অনুভব করেছিল সব কিছুর একটা রিভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড জরুরি নইলে হারিয়ে যায় সবকিছু। যেমন হারিয়ে যায় প্রতিটি মানুষের নিজস্বতা, নিজস্ব স্বর! যেভাবে হারিয়ে যায় ভাষা, ছোট ছোট নদী, গ্রাম, জনপদ, মানুষ। আসলে সব মাইনর নিজস্বতা ভুলে মিশে যায় মেজরের সঙ্গে, বৃহতের সঙ্গে। মিলে সুর মেরা তুমহারা, আসলে সব মিলে মিশে যায়। আলাদাভাবে মাইনরের কোনো অস্তিত্ব নেই।

মেঘ করলে পাহাড়টা আর দেখা যায়না! আকাশ পরিষ্কার থাকলে পাহাড়ে আলোর মালা দেখা যায় এ শহর থেকে। আগে এত আলো ছিল না, দেখাও যেত না। মিটারগেজ ট্রেনের চলন্ত কামরায় বসে জানলা দিয়ে পাহাড়ের আলো দেখিয়ে বাবা বলতো , ঐ যে আলো দেখছিস, ওটা তিনধারিয়ার আলো। তার বহুবছর পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে তিনধারিয়ার আলো ছাড়িয়ে খানিকটা উঁচুতে কার্সিয়াং পাহাড়ের আলোও দেখা যেত আর মাঝে মাঝে সামান্য কিছু আলো দেখে চেনা যেত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট লোকালয়গুলো। রাতে অন্ধকারের মাঝে এই আলোর টুকরোগুলো চিনিয়ে দিত জনপদ, আর এখন পুরো পাহাড়টাই প্রায় জনপদ হয়ে গেছে। অসংখ্য আলোর মালায় তিনধারিয়া, কার্সিয়াং সব একাকার!

সন্ধে থেকেই আজকাল রাতের অপেক্ষায় থাকে রজতাভ। অদ্ভুত এক বিষণ্ণতায় কেটে যায় সারাদিন। দিনের পর দিন এভাবে ঘরবন্দী। সন্ধের পর থেকে রাত অবধি কেটে যাওয়া বলতে কিছু জরুরি কাজকর্ম,

ফোন, ওয়ার্ক ফ্রম হোমের প্ল্যানিং ইত্যাদি। আর তারপর রাত বাড়লে নিস্তব্ধ সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়া। আর ঠিক তখনই ফিরে আসে অসংখ্য শব্দ। আজ যেমন আসছে। এই সব শব্দগুলো ফিরিয়ে দেয় একেকটা সময়। গত ক'দিনের ঘরবন্দী জীবন বহু মানুষের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও এই বাধ্যতামূলক নির্বাসনকে মেনে নিতে অসুবিধে হয়নি রজতাভর। যদিও আতঙ্কের জায়গাটা মাঝে মাঝেই জুতোর ভেতর জেগে ওঠা কাঁটার মতো খচ খচ করে! ভাইরাসটা যত ছড়িয়ে পড়ছে, মানুষ ততো নিজস্ব আস্তানায় ঢুকে যাচ্ছে। পরিচিত জনবহুল রাস্তাগুলো ধীরে ধীরে অচেনা লাগা শুরু হয়। ক্রমশ অচেনা লাগে চারপাশটা, এমনকি মানুষগুলোও। আজ খুব ভোরে সেই অচেনা পাখির ডাকটা শুনেছিল রজতাভ। অদ্ভুতভাবে একটানা ডেকে চলা। কী পাখি বুঝতে পারেনি, ঘুমের ঘোরে রজতাভ শুধু অনুভব করেছিল রাত ফিকে হচ্ছে! নিস্তব্ধতা ভাঙবে এবার, কিন্তু পাখিটার একটানা ডাকে, দরজা খুলে যখন ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল, নিস্তব্ধতা তখনও ভাঙেনি, চারপাশ শুনশান!

রাত বাড়লে শব্দের মতো স্মৃতিরাও ফিরে আসে। ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া, নেটফ্লিক্স, ইউটিউবে সিনেমা, এই সব কিছু নিয়ে ঘরবন্দী মানুষের ভালো থাকা, নিরাপদ থাকার চেষ্টা। ভাইরাসের শেকল শিল্প ভেঙে যাবার আশায় সবাই দূর থেকে যোগাযোগে। ভাসছে ভাইরাস, ছড়িয়ে পড়ছে বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে। ভাইরাস ঢুকে যাচ্ছে মনের গভীরে, বাসা বাঁধছে, গ্রাস করে নিচ্ছে সব! তবে এত কিছুর মাঝেও রজতাভ অনুভব করে কিছুদিন থেকেই এই নিভৃতযাপনটা বোধহয় চাইছিল ও! মাঝে মাঝে এভাবে একা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার এক অদ্ভুত মজাও আছে। একা, ভীষণ একা! স্মৃতিময় এই একাকিত্বে মামাবাড়ির ছোটবয়েসে দেখা সেই বইয়ের আলমারিটার কথা মনে পড়ে যায় আজ। একষট্টি সনের মার্চ মাসের কোনো এক বর্ষণমুখর দিনের উল্লেখ করা বইটা রজতাভ প্রথম দেখে মামাবাড়ির সেই বইয়ের আলমারিতে। শতবর্ষের প্রেমের কবিতা — কে কাকে দিয়েছিল লেখা নেই, শুধু লেখা ছিল , 'যে আমারে দেখিবারে পায়, অসীম ক্ষমায় ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি...।' শহর ছাড়িয়ে প্রায় তিরিশ- পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরের এই মামাবাড়ি ছিল রজতাভর এক প্রবল আকর্ষণের জায়গা। আর তার অন্যতম কারণ ওই বার্মাটিকের বইয়ের আলমারি। বার্মাটিকের ওপর লালচে বার্নিস সময়ের স্রোতে অনেকটাই ম্রিয়মান, অনুজ্জ্বল। সমস্ত বাড়িটার মধ্যেই একটা গা ছমছমে ব্যাপার। আধো আলো অন্ধকারে সে যেন এক রূপকথার বাড়ি। সামনে, পেছনে বিরাট বাগান। সামনের অংশে শুধুই ফুল, পেছনের দিকটায় আনারস, নারকেল, সুপুরি, দারুচিনি, আম, কাঁঠাল, লিচু, সবেদা, করমচা ...! কী নেই! সে বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল বসু, যিনি সম্পর্কে রজতাভর মাতামহ, নেহাতই সৌখিন বললে ঠিক বলা হবে না বোধহয়, রীতিমত মেজাজি মানুষ।

এভাবেই কোনো এক গ্রীষ্মের বন্ধে নির্জন দুপুরে, বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে, আলমারির ঝুলন্ত খোলা টিপতালার গণ্ডি পেরিয়ে সোঁদা কাগজের গন্ধ মাখা আলমারিটা খুলে ফেলেছিল সুমন! সবার ওপরের সারিতে মেরুণ রেক্সিনে বাঁধাই গ্রন্থাবলীর সারি- বঙ্কিম, শরৎ, শরদিন্দু আর বাদামি-খয়েরি রঙের রবীন্দ্রনাথ। পুরনো পুজোসংখ্যাগুলো সব একজায়গায়। সাইড পাল্লাগুলো সরিয়ে একে একে বইগুলো নামিয়েছিল সুমন, আবার রেখেও দিয়েছিল যথাক্রমে। তবে বইয়ের ভেতর লেখা সেই লাইনগুলো দাদুর হাতের লেখা নয়। রহস্যময় সেই মামাবাড়ির চূড়ান্ত রহস্যময়তার সবটুকু যেন এসে জমা হয়েছিল ওই আলমারির ঘরে। সেই নির্জন দুপুরে পুরনো কাঠের আলমারিটা থেকে কিছুটা সময় খসিয়ে নিয়ে সার সার বইগুলোর মাঝে ছোট্ট একটা ফাঁক তৈরি করেছিল, কেউ বুঝতে পারেনি!

।। ২ ।।

প্রত্যাশিত বৃষ্টিটা নেমেছিল কিন্তু তারপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাতে একা একা ছাদে এসে দাঁড়ায়। আকাশভরা তারা। রাত বাড়লে উদ্ভট সব কল্পনা মাথার ভেতর খেলা করে আবার দিনের আলো ফুটলে সে'সব উধাও! তবে রবিঠাকুরের সেই লাইনটা মাঝে মাঝে বড় সত্যি মনে হয়, রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে। তারপর ফের জেগে ওঠে সূর্যোদয়ের পর। মেঘহীন আকাশে আজ ঝলমল করছে তারাগুলো। সেই বহুকাল আগে টিভি-তে দেখা মুঙ্গেরিলালের হাসিন স্বপ্নের মতো নানান রকম ফ্যান্টাসির স্রোত নিরন্তর চলতে থাকে রাত বাড়লে। রাত যত বাড়ে, পরিষ্কার আকাশে তারারা তত উজ্জ্বল হয়। আকাশের দিকে আজ হাত বাড়ায় রজতাভ, তারারা সব নেমে আসে, ওদের সঙ্গে গল্প হয়। বন্ধুর মতো সেইসব তারারা গল্প করে, নতুন নতুন পরিকল্পনা জানায়, প্রাণিত করে ওকে! অনেকদিন পর মামাবাড়ির বার্মাটিকের আলমারি থেকে আনা সেই শতবর্ষের প্রেমের কবিতা বইটার কথা মনে পড়ে। হাতের লেখাটা কার, কে কাকে দিয়েছিল সবই রহস্যময় রয়ে গেছে আজও।

নিজের অবিবাহিত জীবন নিয়ে কোনো আক্ষেপ বা অপূর্ণতা নেই রজতাভর। বিয়ের বয়েস পেরিয়ে গেছে এমনটাও নয়। এই মধ্যতিরিশে বিয়ে তো করতেই পারে কিন্তু অদ্ভুতভাবে ইচ্ছেটা হয়নি। এ শহরে চাকরির জন্য থাকা। পাশের শহরে বাড়ি হলেও এখানে ছোট্ট এই টু বিএইচকে ফ্ল্যাটটা কিনে নিয়েছে। বাড়িতে সবার আপত্তি ছিল, বিশেষত কাকিমার কিন্তু সে'সবে কর্ণপাত করেনি রজতাভ। হাজারো যুক্তি সাজিয়েছিল নিজের ফেবারে। কাতর স্বরে শেষ পর্যন্ত কাকিমা বলেছিল, তাহলে বিয়েটা করেই নতুন ফ্ল্যাটে

ঢোকো। রজতাভ হেসেছিল, যেভাবে হেসে 'না'-টা বুঝিয়ে দিয়েছে ও চিরকাল। রজতাভর বিয়ে না করার পেছনে কোনো দেবদাসীয় ঘটনা কিংবা ঘটনাক্রম নেই, মূল কারণ কিছুটা অনীহা। আসলে যেভাবে থাকতে চেয়েছে, সেভাবেই আছে- বন্ধনহীন, পিছুটানহীন। রাতে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তারাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হয়, এই তো বেশ আছি। কেমন বন্ধনহীন, মুক্ত!

জি-প্লাস ফোরের প্রাইম এপার্টমেন্টের টপ ফ্লোরে আটশো স্কয়ার ফুটের এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়ে একটা দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়েছে রজতাভ। এ আবাসনের ছাদ বাগানটা ওরই করা। প্রথম প্রথম বাকি আবাসিকরা প্রবল উৎসাহ দেখালেও, সময় যত এগিয়েছে সে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। এখন পুরোটাই রজতাভর দায়িত্ব। এতে অবশ্য মনে মনে কিছুটা খুশিই হয়েছে। আসলে বাগান করাটা একটা আর্ট, আর সবাই সেটা জানেনা। টবের গাছগুলোতে জল দিতে দিতে পাতাগুলো পরম মমতায় ভেজা হাতে পরিষ্কার করতে করতে তারাদের মতই এদের সঙ্গেও কথা বলে রজতাভ। অনুভব করে স্পন্দন। আজ থেকে নয়, সেই স্কুলবেলা থেকেই কাকামণির সঙ্গে থেকে গাছকে ভালোবাসতে শিখেছে। শুধু জল দেওয়া বা আপাত যত্ন নয়, আরও এক দৃঢ়তর সম্পর্কে জড়িয়ে যায় রজতাভ। আজ নাইট কুইন ফুটেছে টবে। ওদের জলপাইগুড়ির বাড়িতেও ছিল নাইটকুইন। বারান্দার টবে ফুটত। কুঁড়ি দেখেই কাকামণি বুঝতে পারত আজ নাইটকুইন ফোটার রাত। সে রাতে কাকামণি যেন একেবারে অন্য মানুষ। সন্ধে থেকেই উত্তেজনা। বহুদিন পর আজ প্রাইম এপার্টমেন্টের ছাদবাগানে আবার সেই নাইটকুইন। আজ আবার খুব বাড়ির কথা মনে হয় - বাবা, কাকামণি, কাকিমা। মা চলে যাবার আগে থেকেই সন্তানহীন কাকিমা আঁকড়ে ধরেছিল ওকে। মা আর কাকিমার পারস্পরিক সম্পর্ক, বোঝাপড়াটাও ছিল অসম্ভব ভালো। ফলে ওদের পারিবারিক যৌথযাপনের ছন্দে কখনও ছেদ পড়েনি। অনেক কম বয়েসেই চলে গিয়েছিল মা। সেবার ছিল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার দিন কয়েক পরেই মা-র চলে যাওয়া। তারপর কাকিমা আরও আঁকড়ে ধরলো ওকে।

মা-র চলে যাবার রাতটা বেশ মনে আছে। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাওয়া। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই সব শেষ। সে রাতেও আকাশ ছিল তারা ভরা , বারান্দায় ফুটেছিল নাইটকুইন। স্তব্ধ হয়ে বসেছিল কাকামণি, একবারও ফিরে তাকায়নি গাছটার দিকে। ভেতর থেকে কান্না বেরিয়ে আসছিল রজতাভর, ভারি হয়ে আসছিল বুক তবু যেন একটা একটা করে পিছুটান কেটে বেরনোর জন্য একধরণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। চিরকালের পিছুটানহীন থাকার এক নিরন্তর ইচ্ছে রজতাভর। সে রাতে মায়ের চলে যাওয়া আসলে এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিল ওকে। শ্মশানে শরীরে হাত রেখেছিল মায়ের। ঠান্ডা, শীতল এক অনুভূতি, অপরিচিত লেগেছিল সে স্পর্শ! যে উষ্ণতায় আজন্ম ছুঁয়ে থাকত মাকে, এ শরীর যেন

অন্য কোন গ্রহের। অপরিচিত। সেই মুহূর্ত থেকে হাল্কা লাগা শুরু হয়েছিল। কেমন এক নির্ভার, পিছুটানহীন! অনুভব করেছিল অস্তিত্ব থেকে অনস্তিত্বে যেতে, সচেতনতা থেকে অসচেতন হতে, আকার থেকে নিরাকারে পৌঁছতে বড্ড কম সময় লাগে। ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢুকে গিয়েছিল মায়ের আজন্ম চেনা শরীর, বেরিয়ে এসেছিল এক কড়াই ছাই। দূরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লাগোয়া হাইওয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল মানুষভর্তি দু'একটা বাস। শেষরাত তখন। বাড়ি ফিরে দেখেছিল নাইটকুইনটা ফুটে আবার চুপসে গেছে।

।।৩।।

অনেকদিন পর আজ আবার বোষ্টমিদিদির দোকানে। সাহুর পাড়ে এই দোকান বড় প্রিয় হয়ে উঠেছে রজতাভর। সুমনই চিনিয়েছিল প্রথম। সুমন ওর অফিসের কলিগ। দু'জন মিলে প্রথম যেদিন বাইকে করে এসেছিল সে'দিনই জায়গা এবং দোকানের প্রেমে পড়েছিল। শহর ছাড়িয়ে, ইস্টার্ন বাইপাস পেরিয়ে বেশ খানিকটা গেলেই শুরু বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট রেঞ্জ। আর সেই ফরেস্টের মাঝেই বয়ে চলা সাহু ! অদ্ভুত পরিবেশ। নদী পেরিয়ে জঙ্গলকে দু'পাশে রেখে ফিতের মতো কালো রাস্তা এগিয়ে গেছে সাহুডাঙ্গির দিকে,সেখান থেকে জলপাইগুড়ি। আর সে রাস্তার পাশেই নদীপাড়ে বোষ্টমিদিদির চা, ঘুঘনির দোকান। ঘুঘনির সঙ্গে ডিমসেদ্ধ। এসব অঞ্চলে করোনা সন্ত্রাস নেই সে'ভাবে। মানুষজন বেশ নিশ্চিন্তে ঘোরা, ফেরা, আড্ডায় রয়েছে। দোকান বলতে একটা গাছের নীচে চারখুঁটির দো-চালা, সামনে কাঠের বেঞ্চ আর বাঁশের বাতা দিয়ে বানানো বসার জায়গা। গতকাল অনেক রাতে ছাদ থেকে নেমেছিল রজতাভ। রাতে সে'ভাবে ঘুম হয়নি। অনেকদিন না বেরোনোয় একটা বিরক্তি তো ছিলই, আর বার বার ভেঙে যাওয়া ঘুম। মোটরসাইকেল নিয়ে সকালেই চলে এসেছে এখানে। সাতটা থেকে দুপুর অবধি খোলা থাকে এ দোকান। গলায় কণ্ঠিধারী স্নেহময়ী দোকানের মালকিনকে ওরা বোষ্টমিদিদি বলেই ডাকে। অনেকদিন পর রজতাভকে দেখে আজ খুব খুশি বোষ্টমিদিদি।

এখানে এলেই এক অদ্ভুত অনুভূতি। চায়ের সঙ্গে ঘুগনি, ডিমসেদ্ধ। অদ্ভুত স্নেহ মাখানো মুখ, কোনো বিরক্তি, অভিযোগ, নালিশ কিচ্ছু নেই। কোনো আতঙ্ক বা শঙ্কার চিহ্ন নেই বোষ্টমিদিদির মুখে। দ্বিতীয় কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে পেছনের জঙ্গলের দিকে হাঁটে রজতাভ, নদীর পাড় বরাবর। যত এগনো যায় গাছপালা ততই বাড়তে থাকে। অদ্ভুত এক পরিবেশ। পাখি, কীট, পতঙ্গ, নদী, হাওয়া সব মিলিয়ে জঙ্গলের এক নিজস্ব ভাষা ! কান পাতে, মন দিয়ে জঙ্গলের সেই ভাষাকে,শব্দকে অনুভব করার চেষ্টা করে। বর্ষার গাঢ় সবুজের সঙ্গে মিলেমিশে যায় রজতাভ। মেঘলা আকাশ আরও কালো লাগে এখানে। অনেকটা ভেতরে চলে এসেছে জঙ্গলের। কেমন একটা গা ছমছমে অনুভূ তি। নিজেকে পর্যটক বা ভ্রমণকারী মনে হয়না, মনে হয়না জঙ্গল দেখতে এসেছে। জীবনের সব পিছুটানকে বিপ্রতীপে রেখে এই জঙ্গল, নদী, শব্দ, মেঘলা আকাশ, বোষ্টমিদিদি

— সব কিছু বড় বেশি আপন মনে হয় আজ ! বার্মাটিকের আলমারি থেকে নিয়ে আসা সেই শতবর্ষের প্রেমের কবিতা বইটার অপরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা লাইনগুলো আওড়াতে থাকে রজতাভ , ''যে আমারে দেখিবারে পায়, অসীম ক্ষমায়, ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি ...'' ! আজ অনুভব করে একমাত্র এই সবুজই পারে সেই অসীম ক্ষমায় দেখতে। সবরকম নাগরিক অসভ্যতামো সহ্য করেও কী অদ্ভুত স্নিগ্ধ এই সবুজ !

--- কাকু, চা !

ডাক শুনে ঘোর ভাঙে রজতাভর। বোষ্টমিদিদি দোকানের ছেলেটাকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিয়েছে।

-- তোমার জন্য চা পাঠায় দিল পিসি... !

-- তুই খুঁজে বার করলি কীভাবে আমাকে !

--কাকু, তুমি তো বেশি দূর যাইতে পারবা না, আমি জানি... ! রাস্তাই তো চিনতে পারবা না, ফিরতেও পারবা না। বলে একগাল হাসে ছেলেটা।

-- তুই চিনিস এই জঙ্গলের রাস্তা... !

-- সব রাস্তা চিনি কাকু... ! সব !

-- আমায় নিয়ে যাবি একদিন, অনেক দূর, অনেক অনেক দূর... !

-- যাব কাকু, এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়াই তো আমার দিদার বাড়ি যাইতে হয় ! আমি তো যাই।

চা খেয়ে দু'জনে একসঙ্গেই ফেরে দোকানে। বোষ্টমিদিদি যেন অপেক্ষাতেই ছিল। কী স্নেহময়ী চোখ ! সে চোখে শুধুই অসীম ক্ষমা। ভালো মন্দ সব কিছু বড় সহজ করে গ্রহণ করার চোখ। অনেক দিন পর রজতাভ আজ নতুন করে অনুভব করে আবার, সব কিছুর একটা রিভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড চাই ! বড় সুন্দর, আপন মনে হয় এই প্রকৃতি আর মানুষগুলোকে। সব যেন মিলেমিশে একাকার। জঙ্গল, নদী, শব্দ, মেঘলা আকাশ, বোষ্টমিদিদি, বাচ্চা ছেলেটা, সব ! ওর প্রাত্যহিক যাপনের মাঝে এও তো এক রিভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড ! নাকি এই প্রকৃতিজীবনের বিপ্রতীপে ওই প্রাত্যহিকতা ? হয়তো দুটোই ! ■

পরশ

■ সুদীপ চৌধুরী

অবশেষে ট্রান্সফারের অর্ডারটা হাতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুজন। এই মফস্বল এলাকায় দুটো বছর ও যে কীভাবে কাটাল তা ভাবলে আঁতকে ওঠে। সারাটা দিন কাটলেও সন্ধ্যা নামলে বহির্জগতের মত ওর মনোজগতকেও যেন অন্ধকার গ্রাস করত। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্ধ্যা নেমে এলে সুজন ভোরের আলোর জন্য প্রতীক্ষা করত। ব্যাটারি চালিত টিভির পর্দায় সুজন বাজেট দ্যাখে আর অবাক হয়ে যায় ভেবে যে তিয়াত্তর বছরের স্বাধীনতার দেশে এখনও এখানে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। সুজনের কোয়ার্টার্সের পিছনে সারি সারি তালগাছগুলি শ্যাওড়া গাছের পেত্নীর মতো মনে হয়। আজন্ম শহুরে সুজনের চাকরি জীবনের এই দুই বছর যেন রামচন্দ্রের চৌদ্দ বছর বনবাসের মতই মনে হয়েছে। তাই আজ অর্ডারটা হাতে পেয়ে সুজন মধুকাকাকে নির্দেশ দিল ওর বাক্স-প্যাঁটরা সব গুছিয়ে ফেলতে। কথা প্রসঙ্গে মধু কাকা বলল- স্যার, তাহলে আপনার আর আশ্রম দেখা হল না। সুজন বলল, কোন আশ্রমের কথা বলছো কাকা? মধু জানায়- আরে ওই যে ফাদার ডিসুজার ওই অনাথ আশ্রমটা, কী যেন নাম- হ্যাঁ মনে পড়েছে, 'আশ্রয়'। ফাদারকে কিন্তু আপনি বলেছিলেন একদিন ওঁর আশ্রমটা দেখতে যাবেন। সুজন কি চিন্তা করে বলল, বেশ, হাতে তো আমার দুটো দিন আছে। চলো কাকা কালই যাই ওঁর আশ্রমে। তুমি ঠিকই বলেছ। দেখা হলেই উনি বার বার ওই আশ্রমে যাওয়ার আমন্ত্রণ করেছেন। মধু কাকা বলল- বেশ, তবে স্যার ফাদারের সামনে অনাথ শব্দটা কিন্তু উচ্চারণ করবেন না, ফাদার এতে অসন্তুষ্ট ও কষ্ট পান।

(২)

গাড়ির হর্ণ শুনে ফাদার নিজেই গেট খুলে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন সুজনকে। ফাদারের সঙ্গে বীথি পথে হাঁটতে হাঁটতে আশ্রমে প্রবেশ করল সুজন। ওরা দুজন কৃষ্ণচূড়া গাছের শানবাঁধানো বেদীতে বসল কিছুক্ষণ। কিছক্ষণ পরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো একটি স্নিগ্ধ কিশোরী এসে করজোড়ে নমস্কার জানাল।

সুজন প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বলল, তোমার নাম কী? মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে কিশোরীটি বলল, নয়ন। সুজন বলল, বা! ভারী মিষ্টি নাম, মা দিয়েছেন বুঝি? কিশোরী ফাদারের অবস্থান ঠাহর করে আঙুল নির্দেশ করে বলল, ফাদার, ফাদার দিয়েছেন এই নাম। আমাদের এখানে সকলেরই নাম দিয়ে থাকেন ফাদার। ফাদার

বললেন, চলুন আপনাকে আমাদের আশ্রমটা ঘুরিয়ে দেখাই। সুজন বলল, নয়ন যে অন্ধ আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারিনি। তবে নামটা ভারী সুন্দর দিয়েছেন 'নয়ন'। হঠাৎ একটা ধবধবে সাদা খরগোশ ফাদারের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ফাদার পরম স্নেহে খরগোশটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বলল-হ্যাঁ, এই আশ্রমে আসার পর সাধারণত আমরা ওদের একটা নাম দিয়ে থাকি, কারণ ওরা একটা নতুন জীবন লাভ করে বলতে পারেন। এই ধরুন না নয়নের কথা। ওর মা ওকে চার্চে নিয়ে যাবে বলে ব্যান্ডেল স্টেশনে ঘুম পাড়িয়ে রেখে চলে যায়। কিছুক্ষণ থেমে ফাদার বললেন -ওর শতছিন্ন সোয়েটারে একটা সেফটিপিন মেরে ওর মা সুন্দর হাতের লেখায় একটা চিরকুট আটকে দিয়েছিলেন। ও খুব গরিব ঘরের মেয়ে। ওর মাতাল লম্পট বাবা ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। মায়ের মন তো। জানেন, ওর মা একটা খুব দামি কথা লিখেছিল। সুজনের কৌতূহলী চোখদুটি দেখে ফাদার মৃদু হেসে বললেন- খুব কৌতূহল হচ্ছে না? হওয়াটাই স্বাভাবিক। আসলে আমরা কে আর এদের জীবনের খোঁজ রাখি বলুন। নিজের সুখ শান্তি বৈভব নিয়ে ভাবতে ভাবতেই তো জীবনটা শেষ হয়ে যায়। কে যেন সুজনের বিবেকের দরজায় সজোরে কড়া নেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রস্ফুটিত বোগেনভেলিয়ার দিকে তাকিয়ে ফাদার বললেন -ওর মা লিখেছিলেন- ''মা আমার, তোকে চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম। কিন্তু ঠাকুর ঠিক তোকে কোন-না-কোন পারে তুলে নেবে। মারে! অন্ধ হয়ে জন্মেছিলি বলেই এই কুৎসিত পৃথিবীটা চাক্ষুষ করার যন্ত্রণা থেকে তুই বেঁচে গেলি''। সুজন আর ফাদার দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ । তারপর ফাদার উদাস নয়নে বললেন, জানিনা ওর মা কে, কী তার পরিচয়। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর একটা উপলব্ধিকে ওপর মা লেপ্টে দিয়ে গেল ওর শতছিন্ন পোশাকটার গায়ে। চিঠিটা আজও আমি মাঝেমাঝে পড়ি। নয়নের বয়স তখন তিন কি চার। সুজনের বুকটা ভারি হয়ে আসছিল। মনে পড়ে গেল সেই ছোটবেলায় পড়া হেলেন কেলারের দিদিমণি মিস সুলেভান এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি -''ইট ইজ নট এনাফ টু হ্যাভ অনলি আই-সাইট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইনার সাইট।'' সুজন অবচেতন মনেই বলে- বিশ্বাস করুন ফাদার, এখানে না এলে একটা বিরাট কিছু মিস করতাম। মনে মনে ভাবল -ফাদারের মত মানুষেরাই সত্যিকারের ভগবান। কতটা আত্মত্যাগ থাকলে এরকম নিঃস্বার্থভাবে একজন মানুষ ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতার মধ্যে নীরবে সমাজের এইসব অসহায় মানুষগুলির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে। কেয়ারি করা রাঙামাটির পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে থামল একটি টিনের চৌচালা মাটির বাড়ির সামনে। ধবধবে নিকোনো উঠোন। মাটির দেওয়ালে নরম শরীর জুড়ে সাদা লতাপাতার আলপনা। চৌচালা জুড়ে প্রস্ফুটিত কিশোরী মাধবীলতা যেন তার আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। অলির ব্যস্ত আনাগোনায় সোহাগের পরশ। এই অকৃত্রিম নয়নাভিরাম সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে করতে সুজন হারিয়ে গিয়েছিল নিজের চেতনার জগৎ থেকে। সম্বিত ফিরে পেল 'বাবা'

সম্বোধনে। পিছন ফিরতেই সুজন দেখল একজন বৃদ্ধা একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন- বসো বাবা বসো। শুভ্রকেশী সাধিকারূপিণী বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে সুজনের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। বৃদ্ধা মৃদু হেসে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন বাবা? বসো। তুমি আমার ছেলের মত। তাই তোমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করলাম। তোমার কথা অনেক শুনেছি আর আজ তুমি স্বয়ং আমাদের 'আশ্রয়'-এ এসে উপস্থিত। বসো বাবা। আমি শরবত বানিয়ে আনছি। বৃদ্ধা ঘরে প্রবেশ করলে ফাদার বললেন- আমাদের আশ্রমে দশ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকেন। উনি তার মধ্যে একজন। উচ্চশিক্ষিতা। এমএবিটি। শিক্ষকতা করতেন। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ছেলে বউয়ের অত্যাচারে ওদের বাড়ি-ঘর জমিজমা সব দিয়ে-থুয়ে এখানে পরম শান্তিতে আছেন বলে তিনি মনে করেন। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ভার উনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। পেনশনের টাকা ওই কাজেই ব্যয় করেন। এমন সময় বৃদ্ধা শরবতের গ্লাস এনে বললেন- খাও বাবা। মুখের সামনে ধরতেই সুজন 'আঃ' উচ্চারণ করে বলল- কী সুন্দর গন্ধ! বৃদ্ধা স্নেহার্দ্র হাসিতে বললেন -আমাদের আশ্রমের গন্ধরাজ লেবু আর তার পাতা ছিঁড়ে বানিয়েছি। সুজন পরম তৃপ্তিতে শরবত শেষ করে বলল- কতদিন পরে যে এমন শরবত খেলাম তা বলতে পারব না মা, মানে মাসিমা। 'মা' ডাক শুনে বৃদ্ধার বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। কতদিন পর তিনিও যে মা ডাক শুনলেন তা তিনিও বলতে পারবেন না। ক্ষণিকের জন্য বৃদ্ধা সুজনের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অশ্রু সংবরণ করে বললেন- বুঝেছি বাবা, তোমার খুব ভালো লেগেছে। আমি আর এক গ্লাস নিয়ে আসছি। একথা বলেই তিনি ঘরে প্রবেশ করলে সুজনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল বৃদ্ধা আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছছেন। সুজনের মনটা কেমন ভারি হয়ে এল। এমন সময় তারুণ্যে ভরপুর এক আদিবাসী তরুণী কেমন মৃগশিশুর মত লাফাতে লাফাতে এসে ফাদারকে ইশারা করে ডেকে দুই হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে কী যেন বলে সুজনের দিকে তাকিয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নত করে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে সুজনের দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল ঠিক মেঘের আড়ালে বিদ্যুতের মত। কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ আর লাবণ্য টলমল চঞ্চল সৌন্দর্যে অভিভূত সুজন মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইলে ফাদার বললেন- ওর আমি নাম দিয়েছি অলিভিয়া। এমন অলিভ পাতার মতো সবুজ প্রাণবন্ত মেয়েটিকে ওর মাতাল জুয়ারু বাবা মাত্র হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিল পাচারকারীদের কাছে। ভারী মিষ্টি মেয়ে। হাসিখুশি। তবে এখন অনেকটাই সুস্থ। উৎকণ্ঠিত সুজন প্রশ্ন করে -তার মানে? ফাদার বললেন ওর উপর ভয়ঙ্কর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছিল। সম্ভবত পুলিশের হাত থেকেও রেহাই পায়নি। তাই এখনও পুলিশ দেখলে ও কেমন আঁৎকে ওঠে। ওকে যখন এখানে নিয়ে আসা হয় তখন ও সম্পূর্ণ মানসিক অবসাদে আক্রান্ত একজন রোগী ছিল। তারপর ডক্টর জোসেফ-এর চিকিৎসা ও কাউন্সেলিংয়ে ও এখন প্রায়

সুস্থ বলা যেতে পারে। ওর সঙ্গে না মিশলে সেটা বুঝতেই পারবেন না। ডক্টর জোসেফ বেঁচে থাকলে এতদিনে সেন্ট পার্সেন্ট ভালো হয়ে যেত। তবে স্বাভাবিকভাবেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে, একটু সময় লাগবে আর কি। সুজন শুনছিল আর অলিভিয়ার আলুথালু উদ্ভিন্ন চুলের ফাঁকে নিষ্পাপ দুটি কালো হরিণ-চোখ ও পুষ্করিণীর মত সরল হাস্যময় মুখ ভেসে উঠছিল তার মনোদর্পণে। সুজন ভাবছিল — এই বিশাল পৃথিবীতে কত অলিভিয়ার জীবন-তরী ভয়ঙ্কর অনাকাঙ্ক্ষিত সুনামির ঝরে এভাবেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় বাওয়ার আগেই। তছনছ হয়ে যায় জীবনের সবকিছু — সব স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা, না-ফোঁটা কুঁড়ির মতই ঝড়ে পড়ে নীরবে-নিভৃতে মানুষ চক্ষুর অন্তরালে। এই জন- অরণ্যে কে তার খোঁজ রাখে।

সুজন কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে প্রবেশ করছে ক্রমশ। ভাবছে -সত্যিই তো, এতদিন তো এখানেই থাকলাম, আমি কি কখনো এদের কথা এই সব বৃন্তচ্যুত মানুষগুলোর কথা ভেবেছি এর আগে! ক'জন মানুষই বা আছেন ফাদার ডিসুজার মত যারা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো নীরবে অসহায় মানুষগুলির সহায়-সম্বল হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই খুঁজে পান মানব-জীবনের সার্থকতা, বেঁচে থাকার আনন্দ। এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সুজন স্পষ্ট শুনতে পেল, কে যেন বলছে, সুজন, একজন ডাক্তার হিসেবে, সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে এইসব দুঃস্থ অসহায় স্বজনদের পাশে দাঁড়ানোর মতো মহান কর্তব্য থেকে তুমি কি নিজেকে এড়াতে পার? শহুরে বিলাসী জীবনের স্বাদে অভ্যস্ত বলে এ-ই মফস্বল এলাকা ছেড়ে পালানোর জন্যই কি তুমি কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ খরচ করে নেতা আমলা ধরে তোমার ট্রানস্ফারটা কনফার্ম করালে সুজন? একবার ফাদার ডিসুজার কথা ভাবো, সোশিয়োলজিতে ডক্টরেট যে মানুষটি নামের আগে ডক্টর শব্দটা পর্যন্ত বসান না, যে মানুষটি নিজের সবকিছু ত্যাগ করে সুদূর গোয়া থেকে এখানে ছুটে এসেছেন তোমারই আর্ত-স্বজনের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে, আর তুমি? সুজন বলল- কিন্তু এটা তো ফাদারের ধর্ম। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি অস্বীকার করতে পার স্বামীজির সেই শাশ্বত বাণী- বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর? তোমার কি একবারও মনে পড়ে না বিশপস ক্যান্ডেলস্টিক্স এর সেই বিখ্যাত উক্তি। সুজন অজান্তেই উচ্চারণ করে -'অলওয়েজ রিমেম্বার মাই সন দ্যাট দিস পুওর বডি ইজ দা টেম্পল অফ লিভিং গড। অলওয়েজ রিমেম্বার মাই সন..'।

কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে সুজন এতক্ষণ কারো সঙ্গে কথা বলে চলছিল। ফাদার ডিসুজা সুজনের কাঁধে হাত রাখতেই সুজন সম্বিত ফিরে পেল। সুজন পকেট থেকে ট্রান্সফার লেটারটা বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। হঠাৎ কেমন একটা দমকা হাওয়ায় টুকরোগুলো প্রথমে অনেক উপরে উঠে গেল। তারপর সেগুলো ভাসতে-ভাসতে সুজনের দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।■

তেজ

দেবব্রত সিংহের কবিতা আশ্রয়ে নাট্যরূপ প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

(একটি সমবেত গুনগুন উল্লাসের মধ্য থেকে একে একে স্পষ্ট হয় কণ্ঠস্বরগুলি)

১. আমি বইলেছিলাম না, এ মেয়েটো একদিন আমাদের গেরামের মুখ উজ্জ্বল কইরবে।

২. আমাদের গেরামের নামটো, এই জঙ্গলঘেরা গেরামের নামটো একেবারে আকাশে তুইলে ধরলো গো। সক্কাল থিকে টিভির লুক, কাগজের লুক- এক্কেবারে জমজমাট কান্ড বটে!

৩. আরে দেখতে তো হোবে, কামিন ছিল কাদের বাড়ির! আমাদের বাড়ির নামটোও আজ সবাই একটুক করো।

৪. উ তো আমার খেলার সাথী ছিল। এতটা ক্ষমতা যে উর ভিতরে লুকাই আছে তা তো কুনোদিন বুঝি নাই।

১. উর বাপটো তো মইরে যাবার আগে পাট্টি কুরতো আমাদের। বাপের সঙ্গে মেয়েটাও কতবার শহরে গেইছে আমাদের মিছিলে।

৫. আমার ইস্কুলের ছাত্রী ছিল, কুনোদিন মিছিলে যেতে তো দেখি নাই উকে, পড়াশুনা লিয়েই তো ছিল সবসময়।

১. তুমি তো থাকো মাস্টার ইস্কুল আর পড়াশুনা নিয়ে। তুমি কি আর সব দেইখে বইসে আছো! সব বিষয়ে কথা বুইলো না মাস্টার। তুমাকে তো জানতাম আমাদের লুক বলেই। একটুক যেন অন্যরকম বাজছো আজ।

৫. না বাবা অন্যরকম আর বাজবো কেনে। হয়তো যেত মিছিলে, আমিই দেখি নাই হবে। কিন্তু আমার ইস্কুলের গর্বের কথাটাও একবার ভাব।

৬. মেইয়েটা কে বটে? নামটা কী? কার মেয়ে?

২. তুমি কি ঘুমাই ছিলা নাকি হে, সক্কাল থেকে এত হল্লা যারে নিয়ে তার নামটাই এখুনো জান না।

সকলে।। উ হ'ল আমাদের------

সাঁঝলি।। সাঁঝলি গো সাঁঝলি, আমি জামবুনি কুইরি পাড়ার শিবু কুইরির বিটি সাঁঝলি। সেই ছুটটো বেলাটো

থেইক্যে শুইন্যে আসছি 'বিটি না মাটি', ঠাকুমা বইলতেক 'পরের ঘরের হিসেল ঠেলবে, তার আবার লিখা পড়া, গায়ের বাবুরা বইলতেক 'তুই কুইরি পাড়ার বিটিছিলা কামিন খাটা ছাড়া তুর গতি কী? ।বাপ বুইলতো-

শিবু।। দেখ সাঁঝলি, মন খারাপ করলি তো হাইরে গেলি। শুন, যে যা বলে বুলুক, এসব কুথা এক কানে শুনহে আর এক কানে বাইর কইরে দিবি।

সাঁঝলি।। তখুন বাবুপাড়ার ঘরে কামিন খাইটতো আমার মা! ক্ষয় রোগের তারসে মায়ের গতরটা ভাঙে নাই অতটা! মাঝে মধ্যে জ্বর-টর আসথো বটে! জ্বর আসলে মা চুপচাপ আঙনাতে তালাই পাইত্যে শুয়ে থাকতো। মনে আছে সে ছিল এক জারকালের সকাল, রোদ উঠেছিল ঝলমলানি,ঝিঙাফুলা রোদ। আমি সে রোদে পিঠ দিয়ে গা দুলায়ে পড়ছিলাম কেলাস সেভেনের সামন্তরাজার ইতিহাস-

দিদিমা।। বাবুদের বাড়ি থিক্যে আজও মানুষ এস্যেছিল তুকে ডাকতে।

মা।। আমার শরীরটো তো আর চলছে নাই।

দিদিমা।। তা বুললে চলবে কেনে? তারা কামিন রেখ্যেছে সে তো আর লিজেদের গতর লাড়িয়ে কাজ করার জন্য লয়।

মা।। কিন্তু আমি যে উঠতে লারি।

দিদিমা।। সে মানুষ বুইল্যে গেছে, আজও না গেল্যে অন্য কামিন খুঁজবে তারা। কামটো চইল্যে গেলে সংসারটো গিলবে কী?

মা।। তো আমি কি কুরবো? সাঁঝলি, মা একটুক জল দে!

(সাঁঝলি জল আনতে যায়। জল এনে মাকে দেয়। মাথায় হাত বুলায়)

দিদিমা।। মেয়েটো যাক, মার কামটো কইরে দিক দু-চারদিন। (সাঁঝলি চমকে তাকায়) কামটাও বাঁচে আর তাদেরো সুবিধা হয় সংসারে।

মা।। কিন্তু ও যে কচি মেয়্যে।

দিদিমা।। উঃ, দুদিন বাদে যাব্যে শ্বশুর ঘরে, পেটে ধইরবে ছেল্যে, কচি মেয়্যে।

(মা অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় মেয়ের দিকে।সাঁঝলি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। চলে আসে মঞ্চের কোণায়। মা এবং দিদিমা মঞ্চ থেকে সরে যায়।)

সাঁঝলি।। যেত্যে হল বাবু। গেলাম সেই পথম কামিন খাটতে। সামন্ত রাজার ইতিহাস বন্ধ রেখে আমি গেলাম বাবুর বাড়িতে। **(মঞ্চ জুড়ে ঘুরতে ঘুরতে।)** পুরনো ফটক ঘেরা উঠান, অত বরহ দরদালান, অত বরহ বারান্দা। সব ঝাট ফাট দিয়ে সাফসুতরা কইরে যখন আসছি চইল্যে-

গিন্নিমা।। এই বাসনগুলো ধুয়ে রেখ্যে যা সাঁঝলি।

সাঁঝলি।। আমি তুমাদের ঝুটা বাসন ধুতে লারবো।

গিন্নিমা।। কি বললি তু ? যত বড় মু লয় তত বড় কুথা। জানিস, তুর মা, তুর মায়ের মা, তার মায়ের মা, সবাই এতকাল আমাদের ঝুটা বাসন ধুয়ো গুজারে গেল, আর তু বুললি ঝুটা বাসন ধুতে লারবি !

সাঁঝলি।। হ, বুললাম। আমি তুমাদের ঝুটা বাসন ধুতে লারবো। তুমরা অন্য কামিন খুঁজে লাও গো। আমি চইললাম।

(সাঁঝলি মঞ্চটা এক পাক দিয়ে আসে। গিন্নি বেরিয়ে যায়।)

গিন্নিমার মুখটা যদি তখুন দেখতে বাবুরা ! আগুন যেন ছিটকে আসছে গো। তা বাদে সে লিয়ে কী কান্ড কী কান্ড ! বেলা ডুবলে, মাহাতোদের ধান কাইট্যে বাপ যখন ঘরকে ফিরল-

(মঞ্চে ঢুকে গেছে বাবা এবং দিদিমা)

দিদিমা।। এই মেয়েটো, দুপাতা লেখাপড়া কইর‍্যে মাথায় চইড়্যে বসেছে। গিন্নিমাকে অপমান করে কামটো নষ্ট কর‍্যে চল্যে এল। ওর ছুটো মুখে এত বড় বড় কথা। এর বিহিত তুকে করতে হোবে। সংসারের আয়টো ও বন্ধ করে দিল।

সাঁঝলি।। মা কুনো রা কাড়ে নাই। তেগনাতে আগুন জাইল্যে হাত পা সেঁকছিল আমার মা। একমাথা ঝাঁকড়া চুলে ঘেরা বাপের পাথরের মতো মুখটো ঝইলকে উঠেছিল আগুনের আঁচে। আমাকে কাছকে ডাকে মাথায় হাত বুলাই বাপ বইলেছিল-

শিবু।। যা কইরেছিস বেশ কইরেছিস! শোন, তোর মা, তোর মায়ের মা, তার মায়ের মা, সবাই কইরেছে কামিনগিরি, বাবু ঘরে গতর খাটাই খাইছে; তাতে হইছেটা কি? ই কথাটা মনে রাখবি সাঁঝলি, তুই কিন্তু কামিন হবার লিগে জন্মাস লাই। যত বড় লাটসায়েব হোক না কেনে, কারো কাছে মাথা নুয়াই নিজের তেজটো বিকাবি নাই। এই তেজটুকুর লাইগ্যে লিখাপড়া শিখাচ্ছি তুকে! না হইলে আমাদের মতো হাভাতে মানুষের ঘরে আর আছেটা কী?

(ধীরে ধীরে বাবা বেরিয়ে যায়। দিদিমা বিরক্ত হয়ে আগেই বেরিয়ে গেছে। মা এর পরে)

সাঁঝলি।। বাপ যে দীপটা জ্বাল্যেছিল বুকে সেই দীপের তেজটো বহন করি আমি। আমি জামবুনি কুইরি পাড়ার শিবু কুইরির বিটি সাঁঝলি। কবেকার সেই কেলাস সেভেনের কথা ভাবতে যায়ে, কাগজওয়ালা, টিভিওয়ালাদের সামনে এখন কী যে বলি-

(দ্রুতগতিতে সাঙ্গোপাঙ্গসহ ঢোকে মন্ত্রী)

মন্ত্রী।। কুথায়? সাঁঝলি কুইরি কুথায়? আমার মা কুথায়? **(হঠাৎ সাঁঝলিকে দেখে)** এই তো, খপরটো শুইন্যে আমি সেই লালাপাহাড়ির মিটিং থিক্যে ছুটতে ছুটতে এলম।

মাস্টার।। পন্নাম কর সাঁঝলি, পন্নাম কর।

মন্ত্রী।। বড় হও মা বড় হও। আমাদের গাঁ ঘরের নাম উজ্জ্বল করো। তুমি কামিন খাইট্যে পড়াশুনা কইরে মাধ্যমিকে পথম হইছ, তাই তুমাকে দেখতে আসলাম। সত্যি, বড় গরিব অবস্থা বটে তুমাদের। তুমাদের মতো মিয়েরা যাতে উঠে আসে তার লিগেইতো আমাদের পার্টি, তার লিগেইতো আমাদের সরকার। **(সমবেত হাততালি)** তুমাদের মতো মিয়্যেরা যদি উইঠ্যে আসে, তাহইলে তো ভারতবর্ষ উইঠ্যে আসবেক। **(সমবেত হাততালি)**

সাঁঝলি।। হাঁ, কথাটা খুবই সত্যি! কিন্তু উইঠ্যে আসার রাস্তাটাই যে এখনো তৈয়ার হয় নাই আজ্ঞা! খাড়া পাহাড়ে উঠা যে কি জিনিস- বহুত দম লাগে, বহুত তেজ লাগে!

মন্ত্রী।। রাস্তা আমরা তৈরি করে দুব! সবাইকে একসঙ্গে লিয়েই তো আমরা উপরে উঠতে চাই।কুনো ভাবনা রেইখো না মা। এই লেও, দশ হাজার টাকার নোটটা এখন লেও। শুনো, আমরা তুমাকে আরো ফুল দিব, সম্বর্ধনা দিব, আরো দেদার টাকা তুইল্যে দিব। এই টিভির লোক, কাগজের লোক কারা আছেন এদিকে আসেন বটে!

(টিভি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে সাঁঝলির হাতে টাকা, ফুল তুলে দেয়। টিভিতে ছবি ওঠানো নিয়ে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কির মাঝে সাঁঝলি পিছলে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় মঞ্চের এককোণে।)

সাঁঝলি।। ছোট বড় কত রকমের ঝইলকে উঠল ক্যামেরা, ঝইলকে উঠল মন্ত্রীর মুখ।। না না মন্ত্রী লয়, মন্ত্রী লয়, ঝইলকে উঠলো আমার মরা বাপের মুখ! গনগনে আগুনের পারা আগুন মানুষের মুখ! না, না, ই টাকা আমার নাই লাইগবেক। আর আপনারা যে বুলছেন, আমাকে ফুল দিবেন, সম্বর্ধনা দিবেন, তাও আমার নাই লাইগবেক।

যুবক।। কেনে, কি হইছেরে সাঁঝলি?

সাঁঝলি।। কে বটে তুমি? বড় চিনা চিনা লাগে-

যুবক।। আমি রে সাঁঝলি আমি, সেই যে বাবুদের-

সাঁঝলি।। হাঁ, বাবুদের বাড়ির ছিলাটা বটে! সেই যে বিরাট ঘরটা পরিষ্কার করার সময় কুণার দিকে আমার হাতটা চেইপ্যে ধরেছিল্যে। সেই যে কামিন বিটি বলে চুলের ঝুটিটা নেইড়ে দিয়েছিল্যে! তুমি সেই ছোড়াটা বটে!

যুবক।। **(ঢোঁক গিলে)** সেসব তো কবেকার কথা সাঁঝলি। তুই আমাদের বাড়ির কামিন ছিলি, সে তো আমাদের গর্ব। তাই তো আমি মন্ত্রীকে খপ্পর দিয়ে ডেইক্যে এনেছি। বল, তুর কী লাইগব্যেক বল, খুইল্যে বল খালি- দাদা তো সেই জুন্যই এত্তদূর থেকে ছুইট্যে ছুইট্যে আল্যেন। বল সাঁঝলি-

মন্ত্রী।। হাঁ, বুলো মা, কুনো অভাব তুমার রাখব না! হাঁরে ভিড়টো সরাও কেনে! কাগজের লুকগুলান সব ঠিকঠাক শুনত্যে পাচ্ছেনা বোধহয়। হা বুলো মা, বুলো-

সাঁঝলি।। আমার পাড়ায় শয়ে শয়ে আরো অনেক সাঁঝলি আছে, আরো শিবু কুইরির বিটি আছে গিরামে, তারা যতদিন অন্ধকারে পইড়ে থাকবেক, তারা যতদিন লিখাপড়ার লিগে কেঁদে ফিরবেক, যতদিন বাবু লুকেরা তাদের মানুষ বুলে স্বীকার নাই করবেক, যতদিন ইতিহাসের সামন্ত রাজারা নাম বদল্যে বদল্যে সমাজে ঘুরবেক, ততদিন কুনো বাবুর দয়া আমার নাই লাইগবেক। শুনছেন আপনারা — ততদিন কুনো বাবুর দয়া আমার নাই লাইগবেক। আমার মরা বাপটো শুনতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ, যে গেরাম থিক্যে হাসপাতালে লিয়ে যাবার কুনো ব্যবস্থা ছিল্য না বুলে রাত ভর জ্বরের তাপ গায়ে লিয়ে বিহান বেলায় তুমি শীতল হইয়্যেছিল্যে, সেই গেরামে তুমার সাঁঝলির

কাছ্যে আজ কতো মানুষ। উরা বুলছে, আমার কুনো অভাব রাখব্যে লাই, আমাকে ফুল দিব্যে, সম্বর্ধনা দিব্যে। তুমাকে দিখাতে পারলাম না, যে তেজালো সাঁঝবাতিটা জ্বাইলেছিল্যে আমার বুকের ভিতরে — সে বাতিটো আমাদের কুইড়ে ঘরটাকে কেমন আলো কইরেছ্যে। কিন্তু তুমার কথাটো আমি ভুলি নাই। কারো কাছে মাথা নুয়াই হামার তেজটো বিকাই দিই নাই। তুমার সাঁঝবাতির তেজটো আমি লিভ্যে যেত্যে দিই লাই। এই বাতিটো আমি জ্বাইল্যে দিবো, শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে শিবু কুইরির বিটি, হাজার হাজার সাঁঝলির বুক্যে।

(গান শুরু হয় - 'তুয়ার হাতে দুব, দুব দুব দুব রে... খুলা একখান দা... এই গানের সঙ্গে সঙ্গে সাঁঝলি সকলের দিকে তাকাতে তাকতে যেন সকলকে মানসিকভাবে সঙ্গে নিয়ে সামনের দিকে এগোয়। গানের পরের অংশ 'অসুর তুকে মারতে হবে যা রে বিটি যা... চলতে চলতে দেবী দুর্গার ভঙ্গিতে স্থির হয় সাঁঝলি, পরপর প্রত্যেক অভিনেতা মিলে যেন মঞ্চের ওপর একটি দা তৈরি হয়ে ওঠে।)

প্রযোজনা ঃ শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থা

অভিনয়স্বত্ব সংরক্ষিত

हिन्दी

सुख तक पहुंचने की राह

■ भीखी प्रसाद

सुख तक पहुंचने की राह
छोटे-छोटे स्वार्थ टकराते हैं आपस में टकरायेंगे
वे हमें छोड़ कर भला कहां जायेंगे?
इसी में से निकलेगी कोई न कोई राह ।

थोड़ा-सा चिंतन,
थोड़ा-सा मनन
और विचार के स्तर पर
थोड़ा-सा ऊपर उठना जरूरी है।
आकाश की ऊंचाई पाने के लिए।

मैं आवाज हूँ

■ प्रतिमा जोशी

जी हाँ मैं आवाज हूँ
उन तमाम पीड़िताओं की
जो मौन रहने, कुछ न बोल
कुछ सहे को अपना
नसीब मान लेते हैं।
जो आवाज उठाना चाहते तो हैं
पर जिसे बचपन से ही
खामोश रहने की हिदायत दी जाती है।
चुप्पी साधे रहना, मुंह न खोलना
घर की इज्जत दांव पर
लग जाने का भय दिखाया जाता है।
पर क्या इज्जत सिर्फ उसर घर के लोगों का ?
उसके अस्तित्व का कुछ नहीं ?
उसकी जान की नहीं परवाह ?
संभल जरा, अपनी पुरी ताकत लगा,
बस थोड़ी सी हिम्मत कर
अपनी आवाज कर बुलन्द
साथ हूं मैं तेरे हरदम,
बस तू खुद को दे साथ जरा ।

নেপালী

यस्तै छ है हाम्रो सिलिगुड़ी

■ कृष्ण प्रधान

प्रस्तावना : सिलिगुड़ी

कोही भन्छन् 'सिलिगुड़ी '.
कोही भन्छन् 'सिल्लीगोड़ी',
कोही भन्छन् 'सिलगढ़ी'
उता 'जलपाईगुड़ी,
यता छिर्ने बेलामा 'मल्लागुड़ी'
छेवैमा 'दुर्गागढ़ी',
चिया पसल नजिकैमा,
साक्खै हाम्री माइँली बढ़ी ।

ठूलो छ हाम्रो 'सिलिगुड़ी'.
यसैले गुँथेकी छे महानगरीको पगरी
पचास / साठी लाख गोर्खा सन्तान गल्ली-गल्ली
सड़क र खोलाको बगरभरि ।
घाम लाग्छ चौपट्टको
चरा झार्ने गरी हे हरि !
आन्दोलन हुन्छ घरिघरि
अन्याय र अत्याचारलाई उछिन्ने गरी ।

छन् शहीद दुर्गामल्लका
सन्तान बलैले हाँसेर बाँचेका यहाँ
जस्तै कठोर वज्र परेपनि मिल्छन् सबैसित,
छैनन् जानेका जाई लाग्न हेर ।
सबैसित यहाँ आफ्नत भएका छन् धेर ।
गुँथेकी छे महानगरीको पगरी
जतातै फ्ल्याटै-फ्ल्याट सराबरी

एकताका 'ग्यारेजको देश' कहलाइने 'सिलिगुड़ी'
भव्य यो महानगरी
यस्तै छ है हाम्रो सिलिगुड़ी ।

सिलिगुड़ी : फ्ल्यासब्याक
महानदी नजिक दार्जिलिङ जिल्लाको समभूमिमा
हिमालय पर्वतको काखैंमा गजधम्म यो सिलिगुड़ी ।
पश्चिम बङ्गालको दोस्रो वृहतम् नगरको गुथेकी पगरी
उत्तर-पूर्व भारतको प्रवेशद्वार यो महावाणिज्य नगरी ।।

समुद्रतलदेखि ३९२ फिटमाथि अवस्थित यो
उत्तर बङ्गालको अधोषित राजधानी ।
चिया, काठ अनि पर्यटनले प्रशिद्ध यो
पैंतालिसवटा चिया कमान यसका आङभरी ।।

महानगरीलाई स्वच्छ जलवायु प्रदानकारी
'बैकुण्ठपुर फरेष्ट' र 'महानन्दा वाइल्ड लाइफ सेञ्चुरी'
८३५.५५७835.557 वर्ग किमी फैलिएको यो विशाल महानगरी
८८0 २६ " पूर्व द्राघिमांश अनि २७0 ४३' उत्तरअक्षांश,
हरदर वृष्टिपात ३६२० मि.मी यहाँ
२६-३४0 सेल्सियस तापमात्रा गर्मी याममा
१२-२४0 सेल्सियस तापमात्रा ठण्डी याममा ।
चारवटा पञ्चायत समिति, ग्राम पञ्चायत बाइसवटा
अट्ठाइस मौजाका धनी यो नगरी थाना यहाँ सातवटा
जनसङ्ख्याको घनत्व प्रति वर्गकिमी ६ हजार
यहीँ थुप्रिन्छन् मानिस चारैतिरबाट
दिनहुँ ग्वारग्वार्ती हजारहजार ।।

'महानगरी'-को मुकुट पहिरिएकी
अहो ! यो विशाल वाणिज्य नगरी
सब्जी बेच्थिन् ठाँटबाटले न्यूमार्केट-को छातीभरि

हाम्रै सब्जीवाल्नी छेमा अनि छुच्ची बड़ी
दुङ्दुङ्, रायो, इस्कुस मुण्टा, गुन्द्रुक, गट्टा
किनेमा, रुख टमाटर, इस्कुस झर्झराउँदा
बेतगेड़ा, घिउ सिमी, तिते करेला, नस्पाती
निग्रो, फूलकोपी, मूला, गाँजर, बन्दकोपी
कालोदाल, मस्याम दाल, जतातै सराबरी
आलुबखड़ा, आरुचा, सलक्क परेका काँक्रा
पहाड़बाट ल्याएका साग-सब्जी झर्झराउँदा
न्यूमार्केटको बजारैभरि सराबरी
यता सब्जीवाल्नी छेमा, उता सब्जीवाल्नी बड़ी ।
हाम्रै सब्जीवाल्नी छेमा-बड़ीहरूले मिचेका
सब्जी किन्न जान्थ्यौं हामी छाती फुकाई
छानी-छानी सब्जी किन्थ्यौं नाक घोक्याइँ।

सत्यनारायण पूजा आयोजन गरिन्थे
नेपाली भए जति ठाउँ जतातै
रातभरि नाचगान चल्दथ्यो
भेला हुन्थे सबै जातका झैं-झगड़ा हुँदैनथ्यो ठ्याम्मै ।
अरुणा दिदी आएर गाउँथिन् रातभरि
राणाबस्ती-को सत्यनारायण पूजामा
शरण भेना मेण्डोलियन बजाउँथे
'डम डम डिगा डिगा को धुनमा
राणाबस्ती पागल हुन्थ्यो
बीबी दाजु-को नन स्टप डान्समा ।
एमबी दाजू -को ब्रेअ्रो बज्थ्यो प्रत्येक सत्यनारायण पूजामा
कम्मर मर्काइ-मर्काइ नाँच्थे सबै
थपड़ी बजाउँदै पिटु दाइ-को लोकगतीमा ।
पब्लिक पूजा गजब जम्थे रातभरि गुरुङ बस्तीमा
नवयुवा र सयपत्री सङ्घको भव्य आयोजनमा
रातभरि गाउँथे ठाकुरसिंह मल्ले, 'साइँली बरी चियाबारीमा....
'साथ दिन्थे जीवन अधिकारी'बिर्सेर फेरि मलाई नहेर' स्वरमा

ठिटौले भए पनि भानु रामुदामु मक्ख पार्थे सबैलाई मिठाइलो भाखामा
थपड़ी बजाई कम्मर लच्काई रामलाल अधिकारी खूब नाच्थे,
साना ठूला केही नहेरी तानीतानी हात समाती जबरजस्ती नचाउँथे ।

इण्डियन ओयल नेपाली बस्तीमा
धुमधाम हुन्थ्यो पूजा सत्यनारायण
अर्केष्ट्रा पार्टीलाई पारिश्रमिक लगायत
फूलमालाले गर्थे न्यानो वरण
फर्लङ-फर्लङ रात काट्थे
बूढ़ाबूढ़ीदेखि भुराभुरी जति सबै ।

सत्तरी सालदेखि यता....
रातभरि सत्यनारायण पूजा गर्ने परम्परा
विराम लाग्यो सबै घ-घरमा
भैलिनीहरू पनि ता देखिँदैनन् अचेल साँझमा
यस्तै छ है हजूर हाम्रो यो सिलगढ़ी ।

कृतज्ञता स्वीकार -1.
(क) 'अन्तोःसीमान्तो नोदी' बङ्लापिडिया, 16 जून 2004
Collection Date 16-06-2010
(ख) 'Mahananda River - Encylopaedia Britannica .
Collection Date 15-05-2010
(ग) 'महानन्दा नोदी' - Banglapedia. org.

सिपाही हूँ

■ नीता तामाङ, सिलगढ़ी।

मनभरी देश माया अशेष
सिपाही हूँ! ढुकढुकीमा हुन्छ मेरो देश।

लिई सपना आँखा भरी
बढाउँछु पयर अघि अघि।
काँड़ै काँडा भेटिए पनि
फर्किदिन म भिरु झैं बनी॥

छाल आउँछ कति कति
मेरो पनि भाव देशमा।
कोमलता मर्दै कति कति
म पनि रुन्छु आवेशमा॥

कहाँ हुन्छ मुलायम शयल
योद्धाको भागमा !
कठोर संघर्ष मैं रमाउनुपर्छ
योद्धा सधैं बिपनीमा।

न पोल्छ गर्मीको तापले
न काम्छ हिउँको ठिहीले।
बज्र त ! बज्रै बन्नुपर्छ
सिपाही हूँ म तन-मनले।

शीत झैं आँशु त्यसै नझरोस्
मेरो उत्सर्ग ले देश हासोस्।
मनभरी देश माया छ अशेष
सिपाही हूँ ! ढुकढुकीमा हुन्छ मेरो देश॥

हर्कधोजको ब्यथा.....

■ मणिकुमार शर्मा

अवकाशग्रहन गरेपछि हर्कधोजलाई आँखाको बिरामीले सताउनथालेको छ । ढिलोगरि बिहेगरेको भएपनि तीन छोरा एक छोरीको धनी हर्कधोज । आफ्नी श्रीमती चौथो सन्तान, छोरीकोरूपमा जन्मदिएर बिदा भइन्। साथीभाइले अर्को बिहे गर भनेर उपाय पनि बताएका थिए, तर हर्क धोज त्यसमा सहमत भएन । जीवनभरी किरानीको जागिर खाएर अवकाशप्राप्त । गाँउ समाजमा सम्मान छ, एक कुशल मातृभाषा प्रेमीकोरूपमा । छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमानै जसोतसो विद्यार्जन गराउँदैछ, तर बेलाइतीभाषाको माँखेसाङ्गलोले ब्याप्त परिवेश, घाँटीमा पासो झुण्डाएर ठेली काँधमा भिरेर, देशन भनौ या फेशन या त समयको माग भनौ, भविष्यका कर्नधारहरू युद्ध गरिरहेको अवस्था साथै पश्चिमी सभ्यताले ग्रस्त । सरकारी विद्यालयहरू पनि अछुतो छैनन् । अविभावकहरू पनि गजक्क छन् अनि कोही त भन्छन् पनि, मेरो त छोराले, छोरीले नेपाली बोल्नु चै बोल्छ तर पढ़नु चै जान्दैन, तर अङ्ग्रेजीमाचै पित्त बुझाउँछ ।

गाँउमा हर्कधोजको भाइ मकरधोजको छोरोले बुहारी भित्र्याएपछि भतेर थियो, जसलाई आजका दिनमा "पाटी" भनिन्छ अथवा "रिसिप्सन" पनि भन्नेगरेका छन् । खानाखाने खाइरहेका छन् अनि पिउने पिइरहेका छन् । अर्कोतिरभने नाचगान पनि चल्दैछ । बरेमलागेर गोलो भएर सुसेली पनि बजाउदै आनन्द गरिरहेको अवस्था छ । त्यहीँ, गोलबद्धमा उभिएकी एकजना छोरी गहुँगोरी कालो रङ्गको आधुनिक पोशाकमा घुडाछेउसम्म कालै रङ्गको बुट पहिरेकीले पनि नेपाली गीतमा उसकै साथीहरू पनि नाचीरहेको हेरीरहेकी छे। साथीहरूले उसलाई पनि तान्न खोज्दा उ पछि सर्छे, नाच्दिन । नाच सकेपछि केहीक्षण शान्त हुन्छ तर तुरून्तै एउटा पश्चिमी धुनमा डिजे बज्न थाल्दा थाल्दै ती छोरी जोशकासाथमा नाच्न थाल्छे, कसैले तान्न पर्दैन, साँइसाँइ र सुँइसुँइ सिटी बज्छ, ती छोरी आफनो धुनमा नाची बस्छ । सबैले ताली बजाएर इन्धन दिन्छन्, भतेरनाच खूब चम्किन्छ। हर्कधोजको कान खान्छ उ घरतिर लाग्छ ।

यस्तै परिवेशभित्र हर्कधोज चिन्तित देखिन्छ, त्यहीमाथि आँखाले केहि पढ़नसम्म पनि नसक्ने अवस्था भएको छ । यस्तैबेला हर्कधोजको नाममा डाकवालाले एउटा सरकारी रङ्गको खाम उसलाई थमाउछ। डाकवालालाई केहि भन्न खोज्दाखोज्दै डाकवालाले भन्यो, "घरैमा थुप्रा छोराछोरीहरू छन्, यो खाम खोलेर पढ़न लगाउनुहोस, मलाई हतार छ,झोलामा थुप्रै खाम छन्", डाकवाला हिड्यो । हर्कधोजले खामलाई वल्टाई पल्टाई हेर्यो अनि टेबलमा राख्यो, छोराछोरी कसैलाई पढ़न लगाउँछु भनेर । विद्यालयबाट छोराछोरीहरू आइपुगे, फ्यात्त झोला फ्याकेर लुगाफेरेर भान्छाघरमा खान झम्टिए। त्यसपछि घरमा होहल्ला गर्नथाले । हर्कधोज कोलाहलबाट अलग्गै कोठामा बसेर आफ्नी श्रीमतीलाई यादगर्न थाले ।

केहीक्षण पश्चात घरको वातावरण शान्त भएपछि हर्कधोजले त्यो पत्र पढ़न ठूले, माइलो, कान्छा अनि सानीलाई भन्यो तर सबै टिभी हेर्नमा यस् थिए ।

भोलिपल्ट आइतबार, स्कुल छुट्टी थियो, तर कसैको फुर्सदभने छैन त्यो पत्र पढ़िदिने । हर्कधोजले पत्र खोलेर पढ़ने कोशिस गर्यो, तर पावरवाला चश्मा लगाएर आँखा च्यातेर पढ़ने चेष्टा गर्दा आँसु झर्नथाल्यो, पढ़न सकेनन् । नियास्रो मनलिएर केही सोचिरहेको अवस्थामा रामबाबू हजाम केशकाट्न आइपुग्यो, उसैलाई पत्र पढ़न लगायो । पत्रपढ़ेर रामबाबू हिड्यो, चिन्तित हर्कधोजको मनमा एउटा कविता फुर्यो यसरी

एउटा ब्यथा यस्तो पनि
म त पिड़ाले अस्त ब्यस्त छु
जाबो एक पत्र जो मेरो
मातृ भाषामा छन्
तर पढ़िदिने कोहि छैनन्
घरभरी छन् बर्तमान पिढ़ी
केवल हाँस्छन् मरी मरी
पढ़िदेउन हो भन्छु घरी घरी
तर कोहि आउँदैनन् अघि सरी
ठुले फलाक्दैछ बिदेशी धुन
माइलो ठटाउँदै डिस्को दैलो
कान्छा हिड्यो ह्याप्पी बड्डे केकमा
सानी पनि ब्यस्त टिभीमा
म परे बरै एकलो यो भेकमा
आँखा च्याती हेर्छु तर पावर भएपो देख्छु
धन्न आएछन् रामबाबू केश काट्न
उनैलाइ बिन्ती गर्छु पढ्न भनी भन्छु
रामबाबू हजाम पढ़छन् फर र र
हिज आएको पत्र आज पो थाह पाउँछु
भाषा मान्यता दिवस त गईसकेको पो बुज्छु ।
हरे कृष्ण.... हे भानु तिमी कहाँ छौ। ■

রাজবংশী

ভাষা

■ নিখিলেশ রায়

কোনো কোনো মানষির মুখের ভাষা দোসরা কোনো কোনো মানষি নাও বুঝিবার পায়, তাই বুলি না-বুঝা সেই ভাষাটাক বেয়া ভাষা বা নোংরা ভাষা মনে না করেন।

একঝন মানষির মুখের ভাষা দোসরা একঝন মানষি হয়তো খানিক খানিক বুঝির পায়। মিল চান্দে পায় কোনো কোনোঠে। তায়, বুঝিবার পাইলেয় কি, মিল চান্দে পাইলেয় কি দুয়োটা ভাষা একে ভাষা হবার পারে ?

কাঙো যদি নিজের মাওর ভাষার একটা নাম নিজেয় দিবার চায়, যে নামেয় হউক; দোসরা কাঙো আসি যাতে না কয়, ইঃ, নাম মারাইচে, তোমার এটা কোনো ভাষায় না হয় ! মুই কং, যার ভাষা তারে উপুরা ছাড়ি দেও, উমারো তো মাতব্বর থাকির পারে, মাতব্বরি করিলে উমরায় করুক।

ধরা যাউক, একটা মানষিক দেখি কাহরো একেরে অচেনা নাগিল, তা হইলে কি ঐ মানষিটাক তোমরা নোংরা মানষি কবেন, না বেয়া মানষি কবেন ?

ধরা যাউক, একটা মানষিক দেখি মনে হইল, মানষিটাক আগোত দেখিচুং নাকি, কেনেবা খানিক চিনা চিনার ঢক নাগে ! তা হইলেয় কি উনায় তোমার ছুয়াখাটা ভাগি হয়া যাবে ? তেরো দিনের ?

ধরা যাউক, একটা অচেনা বা আধাচিনা মানষি ভাল করি চিনাপরিচয় দিবার যায়া নিজের একটা নাম কইলেক, যেটা বুলি ডেকাইলে উনায় রাও দিবে, উনার ভাল নাগিবে। তোমরা কি সেলা উনার নাম বদলে দিবেন, কবেন, বাফো রে, তোর নাম হোটা না হয়, তোর নাম হেটা ?

সেইজন্যে কং, বা রে, বেশি অপচ্ছাটা হবার না পাই। ভুকিবার বাদে সইদ্যায় যদি ডেনা নিসপিসায়, ছাম-গাইন জোটেয়া নিজের বাড়া নিজে ভুকান। তেঙো পরার ছামত ঘাটা ঢুকি দিয়া হেল্টেংবেল্টেং করি না ঘাটেন বোল। ঘাটা কিন্তুক ভাঙি যাবারও পায়।

—০—

চৈতমাস

পাঞ্চালী সিনহা

মেলাদিন ঘর থাকি বিরাও নাই
বাইরার দেওয়া দেখা হয় নাই
বুঝা হয় নাই চৈতমাসের দেওয়া থাকি
কতখান তুফান উঠে
কতখান দূর হতে শুনা যায়
পাতখসার শব্দ
এলা চৈতমাস
মাঠের বুক পুড়ি দেয়া চৈতমাস
এই মাসতও ফুল ফুটে
কতখান জোর থাকিলে ফোটা যায়
মরা পাতার বুক থাকি
নিঃশ্বাসের শব্দ শুনা যায়
পাতা খসি পড়ার শব্দ থাকি
ফুল জানে
মাথা তুলির বাদে কতখান দম নাগে
একটা নয়া গছ জানে
বুকের ভিতর খসা পাতার শব্দ সোন্দালে
ফোটা ফুলের গন্ধও রক্তত সোন্দায়

চৈতমাস জানে।

হামার দুখ

নৃপেন বর্মণ

পোয়ালি পাতিয়া শুতিছিনু ঘরোৎ একেলায়
কাপুনিধরা জারোত কায়বা কোটে জীবন বিতাই
ভালেদিন গেইল নেকাপড়া নাই শিখিয়া মুই
হালুয়া পেন্টি নিয়ায় জীবন গেয়িল বুড়ায় হনু,

মাগুরমারি নদীত এলাও মাগুর মাছলা দেখোঙ
বিষদেওয়া জলোত ছটপটেয়া ছটপটায় মাছ
অইনঙ হামা ছটপটেয়া ছটপটাই । অই নাকাতি ।

ভোজভাত

■ নন্দ গোপাল রায়

টারীর চ্যাংগেরাগিলাক নিয়া খগেন ভোজভাত খাবে ঠিক হইল। কিন্তুক কি দিয়া খাবে আর কদ্দিন খাবে সেইটা আর ঠিক না হইল। যাই হোক ভোজভাত খাবার ঠিক হইসে এইটায় হইল বড় কাথা।

কি দিয়া খাবে আর কদ্দিন খাবে -এই মহা ভাবনার ব্যাপারটাক নিয়া পইসাঞ্জের ব্যালা সাতাও খানতো উমার মাথা খগেনের কাথা মতন ডারিঘরটাত টারীর চ্যাংগেরালা মিটিং বসাইল। ভবেন, যতীন,সরেন, নগেন, অনিল সগায় সমাই মতন আসিল আর নানান কাথার পাই ঠ্যাকে দিবার ধরিল। ভবেন কইল,যে সাতাও কারাইসে এই নাখা ঝরিত ক্যাং করি ভোজ ভাত হোবে মুই তো ভাবিয়া কিনো দিশায় না পাবার ধরিসু। আরে হোবে হোবে, খগেন আসিলে তামানে হোবে। সরেন কইল। কিন্তুক যার বাচেচ থাইকতে থাইকতে পইসাঞ্জ গরকি আতি হবার ধরিল অর কিনো অদিস পওয়া নাই গেল। আতি হবার ধরিল বাদে খগেনেরঠে ভবেনক প্যাঠেবার ঠিক হইল। ভবেন না যাবার চাইল বাদে দুই চাইর ঝন দুইটা কাথা শুনি দিয়া জোর করি প্যাঠাইল আর ভবেনও কাথা না বাড়েয়া খগেনের বাড়ির পুখে হাটা ধরিল।

ভবেন হইল আলসিয়া। আম গছগিলার তল দিয়া যাবার নাগে খগেনের বাড়ি। বাইয্যা কালিয়া আতির কুটকুটা আন্ধার খানত গছ তলী দিয়া যাবার নাগিবে বুলি অয় খগেনের বাড়ি আর না গেল। খগেনের বাড়ি না যায়া নিজের বাড়ি যায়া আতির ভাত খায়া কনেক বাচ্চে ডারিঘরটাত আসিল। অক দেখির পায়া আর চ্যাংগেরা গিলা ফপে উঠি কইল,হারে খগেন কোটে ?

ছাওয়া ভুলানি অর নিজের গ্যালগ্যালা হাসি খান দিয়া কইল,মুই আর কোটে গেনু খগেনের বাড়ি। আসিলে অয় আসিবেকে না। মুই কি অক উড়ি আনির পারিম।

কাথা গিলার কি উত্তর দিবে উমুরা অনসে নাই পাইল বাদে চুপ করি গেল। আর কনেক পাছোত ভিজা পখির নাখা কুনঠে থাকি খগেন আসিল। অক দেখির পায়া চাংগেরার সগায় কয়া উঠিল,হারে হামাক সগাকে এইঠে আসির কয়া কুনঠে আটকি থাকিলো ? তে কি ভাবিলো ?

খগেন পাছ পুখের হাত দুইটা আগোত আনি কইল,এই দ্যাখ,মুই কি আনিসু। আন্ধারখানত কাহয় কিন্তুক ভাল্ মতন ঠাহর করির নাই পারিল।

দ্যাখা নাই পাছি। তে কি আনিলো পচ করি কয়া ফ্যালা। নগেন কইল।

ত্যাল,মশলা পাতি জোগার কর। আজি এইলা দিয়ায়

ভোজভাত হয়া যাবে। খগেন হোতোলোই কাপাইতে কাপাইতে কইল।

তামানে জোগার কারা যাবে কিন্তুক ভাল্ মতন কিছু না হোলে ভোজ ভাত হোবে ক্যাং করি? সগায় কয়া উঠিল।

--হইসে, হইসে, তামানে হইসে। তোমারা খালি মশলা পাতি জোগার কর।

ইমিরা কুন দিশা না পাইল। এই সাতাও খানত খগেন কুনঠে কি করিল যে চিন্তা করির নাই নাগে।

অনিল এইবার কইল,ক তো খগেন তুই কি কবার চাইস?

খগেন এইবার হাতের পখি গিলাক ভাল্ মতন দ্যাখে কইল,আজি এইলা দিয়ায় ভোজভাত হোবে।

সগায় ভোজভাতের নয়া জোগার দেখিয়া মহা খুশি।

সগায় কাথা মতন মশলা পাতি জোগার করি আনিল আর ত্যালে -ঝালে বেশ আন্ধন খান সারি দিল। কলর পাতোত সাতাও খনের নগত পারাপারি করি ভোজভাত খওয়া চলিল। কাহয় আর কম না খাইল। এমন খাইল যে মুখ দিয়া নেংগুল ঢুকালে ভাতের নাগাল পাবে এই অবস্থা। ডিকিশুলি খায়া সগারে উক্কুশ পুক্কুশ দশা হইল আর শুকান মচ্চির ঝালোত সগারে মুখ দিয়া নাল বিরিবার ধরিল।

বাইষ্যা কালিয়া ভিজা সিন্ডা আর খড়ি দিয়া আন্ধনবারন আর খানদান সাইরতে বেশ আতি হয়া গেল বাদে কাহয় আর বাড়ি না গেল। ডারিঘরটাতে শ্যাযা পাড়ি থাকি পড়িল। আতি যতয় বারিবার ধরিল ততয় সগারে প্যাটের ড্যাকাডেকি শুরু হইল আর আমাছামা নিন্দের ঘোরোত কাহ কাহ সপোন পাবার ধরিল আর বির বির করি নানান কাথাও কবার ধরিল। কার ঠ্যাং কুন পুখে,কার মাথা দখিন পুখ থাকি পুক পুখে হইল এইলার আর হুস না রইল।

প্যাটের ভুট ভাট শ্যাষোত এমন জাগাত গেল যে সগারে নিন ভাংগি গেল আর আতি নাই পোহাইতে বগলের ধোরটাত যায়া বাইষ্যার সোতাল জলত ধোয়া পাখলা করির ধরিল।

সগায় খগেনক দোষ দিবার ধরিল আর কইল,তুই পখি পয়াল না খওয়ালে আর এই নাখা কাইন্ড না হইল হয়।

উমার কাথা শুনি খগেন কইল,মুই কি তোমাক ডিক্কিশুলি খাবার কইসু।

কাহ আর কাথা না বাড়াইল। পরের দিন ডাক্তার খানা যায়া দাওয়া আর দুই দিন উপাসের পইথ্যের নিদান পায়া নরম প্যাটগিলাক শক্ত করা হইল। তার পাছোত ম্যালা দিন কাহয় আর ভোজভাত খাবার কাথা নাই কইল।■

পাঞ্জাবী

ਥੋੜੇ ਦੀ ਚਾਹ

Inderjeet Kaur
Sevoke Road, Siliguri

ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ
ਰਜਨੀ ਦਾ ਸ਼ਕ ਜਗਾਇਆ,
ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਿੰਡਰਨਾ ਸੀ
ਓਹ ਖਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੁਸਕਾਇਆ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸੜਦੀ ਧੁਪ ਵਾਂਗ ਸੀ
ਓਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਬਰਸ ਓਸਨੂੰ ਨਵਾਇਆ

ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ....
ਓਹੀ ਬਦਲ ਜਦ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਖਿੰਡ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਬਦਲ ਓਹੀ ਬਰਖਾ ਕਰ ਕੇ
ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ...

ਉਹੀ ਧੁੱਪ ਜਦ ਮੁਸਕਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਖੇਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ
ਤੇਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ
ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ,

ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ?
ਕੀ ਹੈ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ?
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ
ਛਿਪੇਆ ਪਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ!
ਵਸਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਠੰਡਕ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!

ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੈਣਾ 'ਕੁਝ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ,
ਬਚਨਾਂ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਤੋਂ
ਛੁਪੀਆ ਹੈ ਸੁਖ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের উন্নয়নের খতিয়ান

'টক্ টু মেয়র'

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় শিলিগুড়ির মহানাগরিক শ্রী গৌতম দেব গত ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে 'টক্ টু মেয়র' কর্মসূচি শুরু করেন। এই অনুষ্ঠানটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পরে রাজ্যে দ্বিতীয়।

'টক্ টু মেয়র' অনুষ্ঠানটি নাগরিকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিষেবা দেওয়ার জন্য শুরু করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো নাগরিক ও প্রশাসনের মধ্যে অভিযোগ সমাধানের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা। শিলিগুড়ির বহু সংখ্যক নাগরিক মাননীয় মহানাগরিকের সঙ্গে সরাসরি তাঁদের সমস্যার কথা বলেছেন এবং তাঁরা সু-পরামর্শও দিয়েছেন। 'টক্ টু মেয়র' অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে দেখা গেছে ৮৫ শতাংশ নাগরিক এই পরিষেবায় খুশি।

পূর্তবিভাগ

পুরনিগমের পূর্ত বিভাগের কাজ পুরসভার অন্তর্গত এলাকায় নাগরিক সুযোগ সুবিধার জন্য পরিকাঠামো তৈরি করা। রাস্তা-ব্রিজ-পার্ক-ভবন ইত্যাদি তৈরি করা এই বিভাগের আওতায় পড়ে। সুদূরপ্রসারী পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা, উন্নতিকল্প এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- বাগরাকোট স্থিত বাস স্ট্যান্ডকে তিনবাত্তির NBSTC বাস স্ট্যান্ডে স্থানান্তর করা হবে। দুটো পর্যায়ে কাজ হবে। প্রথম পর্যায়ে ১৫টি ও পরবর্তীতে আরো ৮টি Bus bay তৈরি হবে। ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।
- মহানন্দা নদীর তীরে বিকল্প রাস্তাসহ ষষ্ঠ মহানন্দা সেতু নির্মাণ যার আনুমানিক ব্যয় ১২০ কোটি টাকা, সেই প্রকল্পের কাজটি RITES নামক সংস্থার মাধ্যমে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমীক্ষা, মাটি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। চুড়ান্ত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে। RITES Feasibility report দিয়েছে। বর্তমানে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সংশ্লিষ্ট অংশে মৌজা ম্যাপ তৈরির কাজ চলছে। এই কাজে পূর্ত ও সেচ দপ্তরও যুক্ত রয়েছে।
- অশোকনগরের সমীক্ষার কাজ নানান কারণে বিঘ্নপ্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই কাজটি আবার শুরু হতে

চলেছে।

- শহরের ড্রেন এবং কন্টুর (Contour) সমীক্ষার জন্য প্রথমে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় এজেন্সির অংশগ্রহন না থাকায় সেটি বাতিল করা হয় এবং পরবর্তীতে রি-টেন্ডার আহ্বান করা হয়।

- প্রতিশ্রুতি মতো পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের পাশে নির্মীয়মাণ ভবনের প্রথম তলায় Quality Control Lab তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা বর্তমানে চালুও আছে। কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ। বোর্ড অফ এডমিনিস্ট্রেটর-এর সময়ে মোট ১৯৭টি কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলি কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং অনেকগুলি কাজ চলছে। বোর্ড অফ কাউন্সিলরস-এর সময়ে ১০৫টি মোট কাজের ৪৩টি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। ৬২টি প্রকল্পের কাজ এখন চলছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ ঃ

এই মুহূর্তে পুরনিগমের ন্যাশনাল আরবান হেলথ্ মিশন (NUHM) এর অধীনে ১০টি আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার (UPHC) সক্রিয় আছে যারা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকে। বিনা খরচে টিকাদান, ডাক্তার দেখানো এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো ছাড়াও মহিলা আরোগ্য সমিতির (MAS) সদস্যরা এ ধরণের সেবামূলক কাজ করে থাকেন ।ইতিমধ্যে এ্যান্টিন্যাটাল কেয়ার (ANC)-এর অন্তর্গত মাতৃসেবা র মাধ্যমে বাৎসরিক সম্পাদিত পরিষেবার সঙ্গে ২৬৪৫ জন শিশুকে টিকাদান, ২৪৩৩জন অল্প বয়সীদের সম্পূর্ণ টিকাদান পুরনিগম সম্পন্ন করেছে। UPHC -এর অধীনে মূলত ওয়ার্ডগুলির বস্তি এলাকায় এখন পর্যন্ত ৩৬০টি প্রচারমূলক ক্যাম্প (প্রতিমাসে UPHC প্রতি ৩টি ক্যাম্প) সংগঠিত হয়েছে এবং ৪৭৯৩৪ জন এতে উপকৃত হয়েছেন। পুরনিগমের UPHC অধীনে ৫২টি বিশেষ ধরণের Fever Clinic Camp করা হয়েছিল ডেঙ্গু ও অন্যান্য ধরণের অসুস্থতা মোকাবিলা করবার জন্য। পুরনিগমের অধীনে ১০টি UPHC সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে NUHM নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং বর্তমানে সেগুলো চালু রয়েছে নমুনা সংগ্রহ করার জন্য।

পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে এখন পর্যন্ত ২১টি 'চোখের আলো' ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ১৮৯৮ জন বিনা খরচে পরিষেবা পেয়েছেন, ২২৪ জনের ছানি সনাক্তকরণ এবং ৫০ জনের ছানি অপারেশন করা হয়েছে। ছানি অপারেশনে সহায়তায় ছিল লায়ন্স নেত্রালয় ও হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট। এছাড়া বিনা খরচে ৩৬১ জনকে চশমা বিতরণ করা হয়েছে। আরো ২টি UPHC র প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। শ্রীনিবাস

সেবাসদনের UPHC এবং শ্রীগুরু বিদ্যা মন্দিরের UPHC -এই দুটি পলিক্লিনিকের অনুমোদন সম্পন্ন হয়েছে। এই পলিক্লিনিক দুটিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা থাকবেন এবং ভবিষ্যতে এক্স-রে করারও ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও প্রত্যেকটি পলিক্লিনিকে থাকবেন ১জন করে স্টার্ফ নার্স। ২০২১-২২ সালে পুরনিগমের ৪৪নং ওয়ার্ডের দশরথপল্লী UPHC রাজ্যস্তরে ''সুশ্রীকায়াকল্প পুরস্কার'' - এ ভূষিত হয়েছে।

মিউটেশন এবং মূল্যায়ন বিভাগ

মিউটেশন বিভাগের কাজ হল সঠিক মিউটেশন ফি নেওয়ার মাধ্যমে মাদার হোল্ডিংকে চাইল্ড হোল্ডিংয়ে (আংশিক/পূর্ণ) রূপান্তর করা। এই কাজের মাধ্যমে শিলিগুড়ি পুরনিগম এককালীন মিউটেশন ফি এবং সম্পত্তির স্থায়ী হোল্ডিং ট্যাক্স এই দুটি উপায় থেকে রাজস্ব পায়। এগুলি ছাড়াও, বিভাগটি আইনসম্মতভাবে সেই সমস্ত সম্পত্তির নতুন হোল্ডিং তৈরি করে যেগুলির কোনও হোল্ডিং নেই। এই বিভাগটি শিলিগুড়ি পুরনিগম নিজস্ব উৎসের মাধ্যমে রাজস্ব উৎপাদনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর মিউটেশন ফি ২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে শিলিগুড়ির জনসাধারণের আর্থিক চাপ অনেকটাই কমেছে। পরে মিউটেশন ফি শতকরা হারে আবার হ্রাস করা হয় যেখানে ০.৫ শতাংশ আবাসিকের ওপর, ০.২৫ শতাংশ উপহার দলিলের ওপর এবং ২ শতাংশ'র পরিবর্তে শুধুমাত্র ১শতাংশ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের ওপর ধার্য করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা খাস (ভেস্ট) জমিতে বসবাসকারী দরিদ্র লোকদের হোল্ডিং নম্বর প্রদানের কাজ এই বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর আবার শুরু করে এবং এতে গরিব মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

এই বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর শিলিগুড়ি পুরনিগমের এলাকার মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাট্টা সমীক্ষার কাজ শুরু করে এবং অনেককে পাট্টা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ

শিলিগুড়ি পুরনিগম LED স্ট্রিটলাইট সেট দিয়ে প্রচলিত স্ট্রিট লাইট প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান ৬৪২৭টি প্রচলিত আলোকে LED স্ট্রিট লাইট সেট দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে যা কয়েকটি পর্যায়ে করা হবে।

শিলিগুড়ি পুরনিগম ২০০টি ৩ ফেজ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পন্ন কংক্রিট খুঁটি (PCC) এবং ইস্পাত নির্মিত নলাকার খুঁটি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছট

পূজার ঘাটগুলির জন্য অস্থায়ী আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

বহুদিন ধরেই শিলিগুড়ির বাসিন্দাদের দাবি ছিল বর্ধমান রোডের বিস্তীর্ণ অংশ যথাযথভাবে আলোকিত করার এবং সেই অনুযায়ী জলপাইমোড় থেকে নৌকাঘাট পর্যন্ত বর্ধমান রোড জুড়ে আলোকসজ্জা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং অতঃপর সেখানে কাজ চলছে।

- শহরে ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজটি শেষ হলে ট্রাফিকের অবাধ প্রবাহ হবে, দৃশ্যদূষণ দূর হবে এবং পাশাপাশি রাস্তাগুলি চওড়া হবে। এই মর্মে DPR প্রস্তুত করা হবে। প্রথম পর্যায়ে মুখ্য সড়কগুলি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ভিতরের রাস্তাগুলি করা হবে। প্রস্তাবিত DPR শিলিগুড়ি বিদ্যুৎ বন্টন বিভাগের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। প্রথম পর্যায়ের জন্য এটি শেষ স্তরে রয়েছে।

- বজ্রপাতের ফলে বিভিন্ন এলাকাতে পথবাতিগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়ি শহরে যত বৈদ্যুতিক পোল আছে তার বেশ কিছু পোলে সঠিকভাবে earthing করা নেই। এতে যেমন পথবাতি খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয় পাশাপাশি জীবনহানির সম্ভাবনা থাকে। শিলিগুড়ি পুরনিগম প্রথম পর্যায়ে ৯ হাজার পোলে earthing করার কাজ হাতে নিয়েছে।

- ৪০ কিমি রাস্তায় স্ট্রিট লাইটের তার টানার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রায় ১১০০ পথবাতি যেগুলো সারাদিন জ্বলতো সেগুলি সুইচ অন ও অফের আওতায় আনা হবে। এতে বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে।

সকলের জন্য গৃহ (প্রধানমন্ত্রী আবাসা যোজনা / বাংলার বাড়ী)

সকলের জন্য গৃহ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুসারে উপযুক্ত শর্ত সাপেক্ষে শহুরে লোকদের পাকা বাড়ি করার জন্য আর্থিক সহায়তা করা।

অবদান

সুবিধাভোগীর অবদান — ৩৫০০০ টাকা

রাজ্যের অবদান (SUDA) — ১,৮৩,০০০ টাকা

কেন্দ্রীয় অবদান (MAHUA) — ১,৫০,০০০ টাকা

রাজস্ব আদায় ঃ

পৌরনিগমে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত পৌরনিগমের রাজস্ব আদায়কারী বিভিন্ন বিভাগের সাথে দফায় দফায় আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে কিছু সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তার ফলশ্রুতি বছরান্তে পৌরনিগমের মোট আয় বৃদ্ধি। বিগত ৪টি আর্থিক বর্ষের রাজস্ব আদায়ের একটি পরিসংখ্যান এইরূপ— ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ (১৫ই মার্চ পর্যন্ত) অর্থবর্ষে পৌরনিগমের ট্যাক্স (Tax) ও নন-ট্যাক্স (Non-Tax) রাজস্ব খাতে সর্বমোট আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৩৯ টাকা, ৩৯ কোটি ৫০ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৩৬ টাকা, ৪৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৮ হাজার ২৭১ টাকা এবং ৬২ কোটি ৩৫লক্ষ ৮৯হাজার ৭০৯ টাকা (approx)। অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবর্ষে মোট ৯.৫৫ শতাংশ ও ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এখনো পর্যন্ত সর্বমোট ৪৪.০৮ শতাংশ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমেয় বর্তমান পুরবোর্ড একদিকে যেমন সুপরিকল্পিত ব্যয় বরাদ্দের লক্ষ্যে যত্নশীল, অন্যদিকে আয় বৃদ্ধিতেও সর্বদাই সচেষ্ট।

সম্পদ শুল্ক বিভাগ

এই বিভাগ শিলিগুড়ি পুরনিগমের রাজস্ব সংগ্রহের উৎপাদন বিভাগগুলির মধ্যে একটি। সম্পত্তিকর কেন্দ্রীয় অফিস এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের I-V নম্বরের বিভিন্ন বরো অফিস দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।

প্রশাসনিক মণ্ডলীর বোর্ডের সময় ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বস্তি এলাকায় সম্পত্তি কর মুকুবের শংসাপত্র বিতরণ সংক্রান্ত একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি, মাতৃসঙ্ঘ জনকল্যাণ আশ্রম, সৎসঙ্গ কেন্দ্র ভক্তিনগর এবং আর্য সমাজ শিলিগুড়ির সম্পত্তি কর মুকুব করা হয়েছে। কর আদায় দ্রুত ও নিয়মিত করবার উদ্দেশ্যে ১৫জন কমিশন ভিত্তিক কর সংগ্রহকারীকে নিয়োজিত করা হয়েছে ঘরে ঘরে কর আদায়ের জন্য। অ্যান্ড্রয়েড পিওএস মেশিনের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পত্তি কর আদায় শুরু হয়েছে।

বস্তি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগ

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মোট ১৮৭টি বস্তি এলাকায় আনুমানিক ২.৫ লক্ষ জনসংখ্যা রয়েছে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই সকল বস্তিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, স্ব-নিযুক্ত কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতিসাধন করাই এর লক্ষ্য।

· স্থানীয় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৩ দিন ব্যাপী আন্তঃ বস্তি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

· ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি পুর এলাকাকে উন্মুক্ত শৌচকার্য মুক্ত অঞ্চল বা Open Defecation Free (ODF) Zone হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। নিজস্ব তহবিল থেকে সারা শহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য যে ১২টি নতুন শৌচালয় তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছিল, সেগুলির অধিকাংশই শেষের পথে। ১১টি কমিউনিটি টয়লেটের মেরামতি শেষ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ODF Plus পর্যায়ের অন্তর্গত ৪৪টি কমিউনিটি টয়লেট (Community Toilet) ও ৭টি পাবলিক টয়লেটের (Public Toilet) কাজ শুরু হয়েছে।

· পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি অন্যতম প্রকল্প, ''মা প্রকল্প''-এর আওতায় ইতিমধ্যে পুরনিগমের ৪টি স্থানে ৫ টাকায় সফলভাবে ভরপেট ডিম ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ক্যান্টিনটি খুব সফলভাবে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। দক্ষতার সঙ্গে এই প্রকল্প পরিচালনার জন্য পুরনিগমকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আরো একটি মা ক্যান্টিন চালু করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩৩নং ওয়ার্ডের গেট বাজার এলাকা ও ৩৬ নং ওয়ার্ডের শান্তিনগর বৌ-বাজার এলাকায় আরো ২টি মা ক্যান্টিন খোলার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

· বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য ইতিমধ্যে একটি বিপর্যয় মোকাবিলা সেল তৈরি করা হয়েছে। বিগত বর্ষায় এই সেল মহকুমা শাসকের অফিসের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সক্রিয়ভাবে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ করেছে।

· বর্তমানে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রকল্পে (NSAP), বার্ধক্য ভাতা (IGNOAPS), বিধবা ভাতা (IGNWPS) এবং প্রতিবন্ধী ভাতা (IGNDPS) পাচ্ছেন মোট ৪৬৫২ জন। এছাড়াও শিলিগুড়ি পুরনিগমের নিজস্ব অর্থায়নে যে সামাজিক সুরক্ষার কর্মসূচি চলছে তাতে বার্ধক্য, বিধবা, প্রতিবন্ধী, অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী, অবিবাহিত এবং অসহায়দের ভাতা এবং সহায় সম্বলহীন (Old & Supportless) ভাতা প্রাপকদের মোট সংখ্যা ৩৫৫৪ জন।

জল সরবরাহ

জল সরবরাহ বিভাগ শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার অধীনে নাগরিকদের স্বাস্থ্যকর, দূষণমুক্ত জলসরবরাহ করে থাকে। জলসরবরাহ বিভাগ শিলিগুড়ির নাগরিকদের পানীয় জল পরিষেবা সংযোগ প্রদান করে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার অধীনে মোট বাড়িতে জল সংযোগের সংখ্যা - ৪২১১৫টি (৩১/১২/২০২২ তারিখ

পর্যন্ত)। ওয়ার্ড নম্বর-৫ এর স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের জলসংকট নিরসনে ৫ নং ওয়ার্ডের গঙ্গানগরে মনিবাবা মন্দির প্রাঙ্গণে ১টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। বর্তমানে আয়রন অপসারণ প্ল্যান্টের কাজ চলছে। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন বস্তিবাসীদের বিস্তৃত এলাকায় বিশুদ্ধ জলসরবরাহের জন্য জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের পিছনে একটি গভীর নলকূপও স্থাপন করা হয়েছে। কাজের বড় অংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আয়রন প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে । ৪৭নং ওয়ার্ডে চাঁদমনির গভীর নলকূপের জল থেকে আয়রন উপাদান দূর করার জন্য একটি লোহা অপসারণ প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার কাজ চলছে এবং শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সমাজের নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ওপর আর্থিক ভার কিছুটা কমাতে এপ্রিল, ২০২২ থেকে আবাসিক জল সংযোগের মাসিক জলের চার্জ মুকুব করা হয়েছে। AMRUT-II প্রকল্পের অধীনে শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং তৎসংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার জন্য জল সরবরাহ প্রকল্পের বৃদ্ধি পর্যায় অনুযায়ী করা হচ্ছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ

আমাদের মাতৃভূমির মহান পুরুষ ও নারীদের জন্ম বার্ষিকীতে এবং প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়াও বিভাগটি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কর্মসূচির আয়োজন করে আসছে। যেমন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বরাক উপত্যকা ভাষা দিবস, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নাগরিক সংবর্ধনা, এভারেস্ট দিবস, রাখী বন্ধন উৎসব ইত্যাদি সফলভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

১৫ এপ্রিল ২০২২, শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে প্রথমবারের মত শিলিগুড়ি পুরনিগম দ্বারা একটি নান্দনিক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং একটি খুব সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলা নতুন বছরকে (১৪২৯) স্বাগত জানানো হয়েছিল। এ বছরও নান্দনিক রূপে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০কে স্বাগত জানানো হবে। এছাড়া ১৬ই আগস্ট ২০২২-এ 'পুরবার্তা নব পর্যায়, স্বাধীনতা সংখ্যা ২০২২'-শীর্ষক একটি বিশেষ সংখ্যা বের করা হয়েছিল। ১লা সেপ্টেম্বর ২০২২, ইউনেস্কো স্বীকৃত দুর্গা পূজা উদ্‌যাপনের জন্য একটি জমজমাট কার্ণিভালেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এতে শিলিগুড়ি নাগরিকদের অভূতপূর্ব অংশগ্রহন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২২ শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার অধীনে ৪৭টি ওয়ার্ডে একযোগে ভোর ৪টায় মহালয়া অর্থাৎ মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠানটিও সম্প্রচারিত করা হয়েছিল। ৭ অক্টোবর, ২০২২, শিলিগুড়ি পুরনিগম দ্বারা শিলিগুড়িতে প্রথমবারের মতো দুর্গাপূজা কার্ণিভালের আয়োজন করা হয়েছিল যাতে

অনেকগুলি ক্লাব এবং সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল। এই কার্নিভাল শিলিগুড়িবাসীর মধ্যে একটি অসামান্য উৎসাহ তৈরি করেছিল। শারদীয়া পূজা পরিক্রমা-২০২২-এর মাধ্যমে দুর্গাপূজার সেরা ৫জন সংগঠককে পুরস্কৃত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে মিলিতভাবে মেরি ক্রিসমাস ডে-২০২২ উদ্‌যাপন করা হয়েছিল।

বিদ্যালয়ের উন্নতির ক্ষেত্রে ৪০ নং ওয়ার্ডের হায়দারপাড়া বুদ্ধভারতী উচ্চবিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরির জন্য ব্যবহৃত ৩টি কক্ষ সংস্কার সাধন, ১৭ নং ওয়ার্ডের হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে স্কুল ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ, নতুন শ্রেণি কক্ষ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

· শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলে প্রথম তলায় ক্লাস রুম নির্মাণের জন্য ১৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫১০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তলায় ক্লাস রুম নির্মাণের জন্য ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪১৭ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। দ্বিতীয় তলার ক্লাস রুম নির্মাণের কাজ চলছে। মূল দুই প্রবেশ দ্বার টেরাকোটা নকশা দ্বারা সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। সীমান প্রাচীরে Women Empowerment এবং West Bengal Tourism এর উপর চিত্রায়ণ করা হয়েছে।

· শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুলের দ্বিতীয় তলার ২টি ক্লাস রুম নির্মাণের জন্য ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮০৯ টাকা অনুমোদিত হয়েছে এবং ৩টি ক্লাস রুম নির্মাণের জন্য ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩১৮ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে এবং এর কাজ চলছে।

বর্ষব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কাজ সুষ্ঠভাবে করবার জন্য একটি সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডার তৈরী করা হয়েছে।

ভবন ও অতিথি আবাস

· পান্থ নিবাসের প্রথম তলটা সুন্দর করে তৈরি করা হয়েছে। বিল্ডিং পুর্ণনির্মাণ করা হয়েছে। এর 2nd floor এবং top floor-এ dormatory করা হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে।

· কিরণচন্দ্র ভবনের বর্তমান ভবনটিকে ভেঙে এটিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে পার্কিং সহ চার তল বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ করা হবে। এই ভবনে Banquet Hall এবং ২৭টি অত্যাধুনিক কক্ষ থাকবে।

· কিরণচন্দ্র শ্মশান ঘাটের উন্নতি সাধন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এতে শৌচালয়,

স্নান ঘর, শ্মশান বন্ধুদের জন্য আশ্রয় ঘর, শবদেহ রাখার স্ট্যান্ড সহ পার্কিং-এর সুবিধা থাকবে। এছাড়া কাঠে শব দাহ করার জন্য আলাদা জায়গা তৈরি করা হচ্ছে।

· শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ১৪ নং ওয়ার্ডে কিরণচন্দ্র ভবনের সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন রূপে এই ভবনটি আগামীদিনে আত্মপ্রকাশ করবে। এখানে একটি তলায় ২ নম্বর বোরো অফিসও স্থানান্তরিত হবে।

· পুরনিগমের নির্মীয়মাণ প্রশাসনিক ভবন প্রাথমিক পর্যায়ে G+2 কাঠামোর নকশা অনুযায়ী তৈরি হচ্ছিল বর্তমানে G+4 কাঠামোর নকশা অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে। ভবনটির ভিতরে বিভিন্ন তলায় আধুনিক পর্যায়ের পরিকাঠামোগত কাজ চলছে। প্রায় ২৫ হাজার বর্গ ফুটের ভবন তৈরি হবে। উপরে ছাদ বাগান এবং নীচে পার্কিং-এর ব্যবস্থা থাকছে। অত্যাধুনিক কাউন্সিল ভবন, সকল মেয়র-পারিষদ সদস্য, চেয়ারম্যান তাদের বসার ঘর, ছোট কনফারেন্স হল, VC রুম, দুটো লিফট তৈরির ব্যবস্থা থাকছে। কনফারেন্স হলে প্রায় ২০০ জন বসতে পারবেন। উন্নতমানের অত্যাধুনিক শব্দ প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা থাকবে। অত্যাধুনিক ভোটিং মেশিন সঙ্গে ডিজিটাল বোর্ড থাকবে এবং খুব শীঘ্রই নতুন ভবনে প্রশাসনিক কাজ শুরু হবে। এছাড়া পুরনিগমের পুরোনো ভবনে বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে ফটো গ্যালারি এবং শিলিগুড়ির ইতিহাস সম্বলিত সংগ্রহশালা নির্মাণ করা হবে, যা মানুষের জন্য খোলা থাকবে। পুরোনো ভবনের মিটিং রুম এবং VC রুম টিকেও ছোট কনফারেন্স হল এবং ছোট VC রুম হিসাবে ব্যবহার করা হবে। পুরোনো ভবনে একটি ছোট গ্রন্থাগার এবং রিডিং রুম তৈরি করা হবে। পুরনিগমের ইতিহাস এবং মাননীয় মেয়রদের ছবি প্রদর্শনের বিষয়টি পুরোনো ভবনে করা হবে এবং সম্পূর্ণ অফিস প্রাঙ্গণটি নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাজানো হবে। দিল্লীর প্রখ্যাত স্থপতি Mr. P.R. Mehta বিনা পারিশ্রমিকে একাজে পুরনিগমকে সাহায্য করছেন।

· ৫টি বোরো অফিসকেই নতুন করে তৈরি করা হবে। ১নং বোরো অফিসটি বর্তমানে যে বিল্ডিং-এ আছে তারই অপর অংশে স্থানান্তরিত করে এটির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত করা হবে। ইতিমধ্যেই ২নং বোরো অফিস-বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, ৩নং বোরো অফিসের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। অস্থায়ীভাবে এটি শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্থানান্তরিত করা হবে। ৪নং বোরোর কাজ চলছে এবং ৫নং বোরো অফিস সংস্কার ও মেরামতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে আছে।

লাইসেন্স প্রদান বিভাগ ঃ

পুর এলাকায় যে কোনও পেশাগত বাণিজ্য করার জন্য নিযুক্ত বা নিযুক্ত হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে

তালিকাভুক্তির একটি শংসাপত্র দেওয়া হয় আইনসঙ্গতভাবে আবেদনের ভিত্তিতে।

বর্তমান বোর্ডের মেয়াদে এই প্রথম অনলাইনে লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ E-District পোর্টালের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন ও পার্কিং বিভাগ ঃ

- শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অননুমোদিত বিজ্ঞাপনের দৃশ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বহাল আছে। ইতিমধ্যে কোর্ট মোড় থেকে ভেনাস মোড়, এয়ারভিউ মোড় ও কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গণকে "No Hoarding Zone" হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- আগামী দিনে সারা শহর জুড়ে অনুমোদনহীন বিজ্ঞাপন বোর্ড ও দেওয়াল লিখনের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে।

তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ

- পুরনিগম অফিসের বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগকে আরো দ্রুত করার লক্ষ্যে Wireless Intercom ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ডাম্পিং গ্রাউন্ড সহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে CCTV install করা হয়েছে। আগামীতে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য এলাকাতেও সি.সি. টিভি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন করা হবে।
- ইতিমধ্যেই ট্রেড লাইসেন্স, জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র প্রদান ও বিল্ডিং প্ল্যানের online পরিষেবা শুরু হয়েছে আগামী অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর (Property Tax) ও মিউটেশন দপ্তরের পরিষেবাও online-এর মাধ্যমে শিলিগুড়িবাসীর কাছে তুলে ধরা হবে।
- পৌরনিগমের বর্তমান website-টিকে আরো তথ্য সমৃদ্ধ ও user friendly করে তোলা হচ্ছে।
- আগামী অর্থবর্ষ থেকে প্রত্যেকটি দপ্তরের কার্যাবলী ধীরে ধীরে e-Office এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপন করা হবে। এর ফলে অতীত আমলের ফাইলগত দীর্ঘসূত্রতা একদিকে যেমন কমে যাবে, অন্যদিকে আরো স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুর পরিষেবা প্রদান করা যাবে।
- ইতিমধ্যে সরকার স্বীকৃত সংস্থা Webel এর সাহায্যে পৌরনিগম অফিস সহ সমস্ত বোরো অফিসের সব

সরকারি নথি Online Data Center-এ ডিজিটাল রুপে সংরক্ষণ করার কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মূল অফিসের জন্ম ও মৃত্যু বিভাগের নথির ওপর কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে আগামী দিনে কোনো সরকারী তথ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা অনেকাংশে কমে যাবে।

· তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলীর গুনগতমান উন্নতিকরণ ও পুরনিগমের বিভিন্ন কাজকে জনসমক্ষে আরো সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে পেশাদার সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।

· মেয়র, ডেপুটি মেয়র, মেয়র পারিষদবৃন্দ এবং আধিকারিকবৃন্দের সঙ্গে বোরো কমিটিগুলি যাতে প্রতিনিয়ত মত বিনিময় করতে পারে তার জন্য বোরোগুলিতে Video Conferencing System এর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ক্রীড়া বিভাগ

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ক্রীড়া বিভাগ শহরের ক্রীড়া জগতের উন্নতি এবং প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই কাজের অংশ হিসেবে ক্রীড়া বিভাগ শহরের বিভিন্ন দুঃস্থ খেলোয়াড়দের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদের এবং শহরের বিভিন্ন ক্লাব ও ক্রীড়া সংগঠনকে খেলার সরঞ্জাম তুলে দিয়েছে। এই বিভাগের কাজের কিছু নিদর্শন এ রকম — 'খেলা হবে' দিবস (১৬ই আগস্ট) পালন, ওয়ার্ড উৎসব ২০২৩-এর অংশ হিসেবে খেলাধূলার প্রসারের জন্য পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে।

· কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ ও দৈনিক ব্যবস্থাপনার হস্তান্তর বিগত ১ বছর সময়কালে আমাদের ক্রীড়া বিভাগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম কমিটি সরকারি নির্দেশে পুনর্গঠিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে এই কমিটির ৫টি মিটিং করা হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এপ্রিল মাসের পর থেকে স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণ খেলাধূলা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না। স্টেডিয়ামের সার্বিক পরিকাঠামোর বিশ্লেষণ ও তদুপরি তার যথাযথ সংস্করণ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

· দীর্ঘ দিন বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা 'বিকাশ ঘোষ মেমোরিয়াল সুইমিং পুল ' চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘর, শৌচালয়গুলিরও সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে এটি পুরোদমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

· ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সার্বিক সংস্করণ শুরু হয়েছে। এই স্টেডিয়ামের একটি অংশে অস্থায়ীভাবে ৩নং বোরো অফিসটি স্থানান্তরিত হবে। প্রয়োজনীয় মেরামতি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে

আগামীতে আন্তঃবিদ্যালয়, আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা যেমন টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্যারাম ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

- সদ্য সমাপ্ত ওয়ার্ড উৎসবে বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা যেমন সংক্ষিপ্ত ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক, ক্যারাম প্রতিযোগিতা, লুডো, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল প্রতিযোগিতা, যোগাসন ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে খেলাধূলার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও অংশগ্রহনে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

- শিলিগুড়িতে প্রথমবার দিন ও রাত্রি পুরুষ/মহিলা 'শিলিগুড়ি মেয়রস কাপ ভলিবল টুর্নামেন্ট' সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

- ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে বোরো ভিত্তিক আন্তঃস্কুল ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা, টেবিল টেনিস, অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হবে।

- ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলে শহরের যে কোনো একটি রাস্তাতে ভোরবেলায় প্রাতঃভ্রমণ এবং সাইকেল চালানোর জন্য "Jogging & Cycling Lane" তৈরি করা হবে।

জঞ্জাল অপসারণ ও যানবাহন বিভাগ

শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবহন বিভাগ শহরে নৈমিত্তিক জঞ্জাল সংগ্রহ এবং ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে তা পৌঁছানোর কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এছাড়াও শহর শিলিগুড়ি এবং লাগোয়া অঞ্চলে পূর্ত বিষয়ক কাজ, স্টেইনলেস স্টীল দ্বারা নির্মিত জলের ট্যাঙ্ক, পথ পরিষ্কার করার গাড়ি, সেসপুল সার্ভিস প্রভৃতি পরিষেবা দিয়ে থাকে এই দপ্তর। বর্তমানে এই বিভাগ বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে পরিষেবা দিচ্ছে।

জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ ঃ

শিলিগুড়ি পুরনিগমের কনজারভেন্সি বিভাগ মূলত শহরের বর্জ্য পদার্থ অপসারণের মাধ্যমে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব পালন করে। এর মধ্যে রয়েছে ড্রেন, রাস্তা, বাজার, খালি জমি পরিষ্কার, ভেক্টর কন্ট্রোল এবং সর্বসাধারণের ব্যবহৃত স্থান পরিষ্কার সুনিশ্চিতকরণ এবং বাড়ি ও বাণিজ্যিক স্থান থেকে সময়মতো বিভাজিত বর্জ্য সংগ্রহ (কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)। এই বিভাগের কাজের বিবরণ নিম্নরূপ —

রাত্রিকালীন নোংরা-আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ নিয়মিত হচ্ছে, ২১ নভেম্বর ২০২২ থেকে সুডা-র অনুমোদনক্রমে প্রত্যেক বাড়িতে বর্জ্য বিভাজন প্রকল্প ০২, ১৩, ১৫ এবং ২০ নম্বর ওয়ার্ডে মডেল হিসেবে

শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা কেন্দ্র তৈরির প্রকল্প United Nation Development Programme : Urban Development and Municipal Affairs -এর অনুমোদন পেয়েছে।

· শিলিগুড়ির সমস্ত ওয়ার্ডে সর্বমোট ১২৪ জন নির্মলসাথী নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট পোশাক প্রদান করা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে ID কার্ড দেওয়াও শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই নির্মলসাথীদের মাসিক পারিশ্রমিক সুনিশ্চিত করতে সুডা প্রদত্ত অর্থ ব্যতীত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেক মাসের ১ দিন বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত দিনের পারিশ্রমিক নির্মলসাথীদের হাতে দেওয়া যায়, ১.৪.২০২৩ থেকে যা কার্যকর করা হয়েছে।

· দীর্ঘ দিনের আটকে থাকা প্রকল্প STP-II ও STP-III-র কাজ যথাক্রমে নৌকাঘাট এলাকা ও ফুলবাড়ী এলাকায় শুরু হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় বরাদ্দ যথাক্রমে ৫৪ কোটি ২২ লক্ষ টাকা এবং ১৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের কাজটি KMDA তত্ত্বাবধান করছে। আগামী দিনে মহানন্দা নদীর দূষণ রোধে ও শিলিগুড়িকে পরিস্কার ও দূষণমুক্ত রাখতে এই প্রকল্পের অশেষ গুরুত্ব রয়েছে। STP-I-এর কাজও দ্রুত শুরু হবে যার প্রকল্প ব্যয় ১৭৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে এই সম্পূর্ণ প্রকল্পটির সর্বমোট ব্যয় ২৭৪ কোটি টাকা।

· এছাড়া Legacy waste অপসারণের জন্য বায়ো-মাইনিং-এর কাজ Zone-3 শেষ হয়ে Zone-2-তে শুরু হয়ে গিয়েছে।

· যত্নের অভাবে পুরনিগমের গাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যেত। এটা দুর করতে ৩টি Vehicle Shed তৈরি করা হয়েছে এবং আরো ৩টি Warehouse তৈরির কাজ চলছে। Warehouse-গুলি তৈরি হয়ে গেলে ভাড়ায় থাকা Warehouse গুলি ছেড়ে দেওয়া হবে। এতে ভাড়ার সাশ্রয় হবে আর গাড়িগুলিও সুরক্ষিত থাকবে।

পরিবেশ বিভাগ

শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগ শহরের পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শহরজুড়ে বৃক্ষরোপণ, অবৈধ প্লাস্টিক বাজেয়াপ্তকরণ, শহরের নদীগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রভৃতি এই বিভাগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বিগত বছরে শহরের এক হাজারেরও বেশি চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তর এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের যৌথ উদ্যোগে বনমহোৎসবও পালিত হয়।

- পথকুকুরদের নির্বীজকরণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ২৫০টি পথকুকুরকে নির্বীজকরণ করা হয়েছে এবং তাদের সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সারা বছর ধরেই নির্বীজকরণ প্রক্রিয়া চালু থাকবে। এই লক্ষ্যে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত ডগ শেল্টারটির স্থায়ীভাবে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে পথকুকুর ধরার জন্য একটি Dog Catcher Van ক্রয় করা হয়েছে।
- পর্যায়ক্রমে খাটালগুলিকে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রান্না করা মিড-ডে-মিল

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ২০০৩ সাল থেকে চালু হওয়া রান্না করা মিড-ডে-মিল প্রদান দেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য সরকারি এবং সরকার-পোষিত সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের, বিশেষত আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের স্কুলের দিনগুলিতে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা। এই প্রকল্প শুরুর সময় থেকেই শিলিগুড়ি পুরনিগম এই মহান উদ্দেশ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এইমুহূর্তে পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের ১৫৩টি সরকারি ও সরকার-পোষিত প্রাথমিক, জুনিয়র হাই, হাই স্কুল এবং NCLP ও বিশেষ স্কুলে এই মিড-ডে-মিল প্রকল্প চলছে।

মার্কেট বিভাগ

- সুভাষপল্লী বাজারের স্টল লিজ দেওয়ার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।
- দীর্ঘ দিন ধরে অবহেলায় পড়ে থাকা হায়দারপাড়া মার্কেট কমপ্লেক্স বিল্ডিংটিকে পুনঃব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট স্টল হোল্ডারদের সঙ্গে দফায় দফায় মিটিং করা হয়েছে। একটি কমিটি গঠন ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামী দিনে এই বিল্ডিংটিরও সংস্কার করা হবে।
- বিগত দিনে DI ফান্ড মার্কেট পুরনিগমের কাছে হস্তান্তরিত হলেও পূর্বে এই বাজারের সীমানা নির্ধারিত হয়নি ও বাজার সংক্রান্ত কাজকর্ম পুরনিগম দ্বারা পরিচালিত হয়নি। পৌরনিগমের উদ্যোগে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক,শিলিগুড়ি SDO অফিস স্থিত DI ফান্ড কর্মী এবং পুরনিগমের মার্কেট বিভাগের কর্মীদের নিয়ে ৪ দিন ব্যাপী একটি যৌথ সমীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার রির্পোট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা গ্রহন করা হবে। তবে ইতিমধ্যেই এই বাজারে একটি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে

এবং নিয়মিত পয়ঃপরিস্কার - ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

- বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট, সুভাষপল্লী বাজার সংস্কার করা হবে। ফুলেশ্বরী বাজারে বর্তমান যে বিল্ডিংটি আছে তার পাশে পার্কিং সহ চারতলার একটি নতুন বিল্ডিং তৈরির বরাত ইতিমধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- ফুলেশ্বরী মাছ বাজারটি আধুনিকভাবে নির্মাণ করা হবে।
- বিবেকানন্দ মিনি মার্কেটটিকে দুটি পর্যায়ে সংস্কার করা হবে। প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় মেরামতি এবং ফেস লিফটিং (Face Lifting) করা হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি তল বৃদ্ধি করা হবে।
- সুভাষপল্লী বাজার মেরামত ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে।
- রবীন্দ্রনগর মাছ বাজারকে স্থানান্তরিত করে সেখান দিয়ে একটি সংযোগকারী রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

স্থানীয় গেট বাজারে ৫টি ছোট রাস্তাকে Pever Block -এর মাধ্যমে উন্নতিকরণ করা হয়েছে।

জন্ম ও মৃত্যু

এই বিভাগ শিলিগুড়ি পুরনিগমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ, কারণ এখানেই শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডের সমস্ত জন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ড নথিভূক্ত থাকে যা শহরের জনগণনা, নারী-পুরুষের অনুপাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। শিলিগুড়ির নাগরিক এই বিভাগ থেকে তাদের প্রয়োজন মতো জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র পেয়ে থাকেন।

রাজ্য সরকার 'জন্ম-মৃত্যু তথ্য পোর্টাল' নামে নতুন অনলাইন পোর্টাল চালু করেছেন। এর আগে নাগরিক নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই শংসাপত্র দেওয়া হত।

সমব্যথী প্রকল্প

এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানত দুঃস্থ পরিবারের কেউ মারা গেলে তার শবদাহ করবার জন্য সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করা হয়। জানুয়ারী ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত শিলিগুড়ি পুরনিগম সমব্যথী প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৮২ জন উপভোক্তাকে এই আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

পার্কস এন্ড গার্ডেনস ঃ

শিলিগুড়ি পুরনিগম ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি চিলড্রেন পার্কের উন্নয়নের ও সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করেছে। এছাড়া কয়েকটি মহাপুরুষের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। অনেক পুরনো মূর্তির সংস্কার সাধনের কাজ চলছে। ২০নং ওয়ার্ডের দুর্গাদাস কলোনীর একটি গলি-রাস্তার পাশের সৌন্দর্যায়ন, ৪৫নং ওয়ার্ডের বলরাম নাথ শিশুউদ্যানের বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ, ১৭ নং ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর পার্কের সৌন্দর্যায়ন, দার্জিলিং মোড়ে তেনজিং নোরগের মূর্তির আইল্যান্ডটির সৌন্দর্যায়ন, দার্জিলিং মোড়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ ট্রাফিক পয়েন্টে-এর নির্মাণ-সৌন্দর্যায়ন, সূর্যসেন পার্কের টয়ট্রেনের ট্র্যাকের গার্ড ওয়াল তোলা এবং মহাকালপল্লীর খেলার মাঠে গেট নির্মাণ, সূর্যসেন পার্কে টয়ট্রেন স্টেশনের চিত্র-সৌন্দর্যায়ন, সূর্যসেন পার্কের সীমানা প্রাচীরের মেরামতিকরণ, সুব্রত শিশু উদ্যানের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন এবং সেখানে শিলিগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বর্গীয় স্বপন সরকারের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন, ২৭ নং ওয়ার্ডের YMA Park-এর সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন, ২২ নং ওয়ার্ডের নন্দন শিশু উদ্যানের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন, ২৫নং ওয়ার্ডের মিলনপল্লীতে সুকান্ত শিশু-উদ্যানের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন, গোষ্ঠ পাল মূর্তির সংস্কার ও নিকটস্থ রাস্তার সৌন্দর্যায়ন, দার্জিলিং মোড়ে গ্লাস-ফাইবার নির্মিত বিশ্ব বাংলা গ্লোব নির্মাণ, নেতাজী বয়েজ হাইস্কুলের পাশে নেতাজী সুভাষ রোডের সৌন্দর্যায়ন, শিলিগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং শিলিগুড়ি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের সামনের গেটের টেরাকোটার নান্দনিক সৌন্দর্যায়ন, নজরুল সরণীতে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি পুনঃস্থাপন, নিউ মিলনপল্লীর নেতাজী সরণিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপন, মহানন্দা ব্রীজের নিচে মহানন্দা নদীর ধারের রাস্তার সৌন্দর্যায়ন এবং সেই রাস্তার 'মোহনবাগান এভিনিউ' নামকরণ ইত্যাদি বহু রকমের সৌন্দর্যায়ন ও নির্মাণের কাজে শিলিগুড়ি পার্কস্ এন্ড গার্ডেন্স বিভাগ যুক্ত আছে।

সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ ঃ

সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ একটি অপরিহার্য দপ্তর যেটি পুরনিগমের বিভিন্ন কাজকর্মে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই বিভাগ সমস্ত ধরণের প্রশাসনিক বৈঠক সংগঠিত করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশনামা ইত্যাদি কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে পরিবেশিত করে থাকে।

· এই অর্থবর্ষে এই বোর্ড দায়িত্বে আসার পর এখনও পর্যন্ত Mayor-in-Council সভা ১৪টি এবং BOC সভা ১৪টি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

· এই অর্থবর্ষে সমস্ত বোরো কমিটিগুলিতে Critical Gap এবং জরুরী ভিত্তিতে কাজের জন্য বোরো কমিটি

প্রতি ১ কোটি টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মোট ৩টি দফায় পর্যায়ক্রমে ৩৫ লক্ষ, ৩৫ লক্ষ এবং ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে।

- ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বোরো ওয়ার্ড ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং রক্তদান শিবির আয়োজন করেছে। এবারে বোরো ভিত্তিক খেলাগুলিকে সম্পন্ন করার জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটে বোরো প্রতি ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

- বিগত ১৩.০২.২০২৩ তারিখে বিগত ৩টি ''টক টু চেয়ারম্যান'' এবং ২২টি ''টক টু মেয়র'' কর্মসূচির রির্পোট কার্ড প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঐ সময় পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp) নম্বরে ও রাইট টু মেয়রের প্রাপ্ত অভিযোগগুলির নিষ্পত্তির ফলাফল সংক্রান্ত রির্পোটও জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে।

- বর্তমান বোর্ডের ১ বছরের কাজের ''মূল্যায়ন প্রতিবেদন'' প্রকাশ করা হয়েছে।

- সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কমপক্ষে একটি নাগরিক সভা এবং বোরো ভিত্তিক নাগরিক সভা করা হবে।

- ইতিমধ্যেই মোহন বাগান অ্যাভিনিউ রাস্তাটি উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আগামী ৩০শে এপ্রিল ইস্টবেঙ্গল লেন রাস্তাটিরও শুভ উদ্বোধন করা হবে।

- আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বাৎসরিক পঞ্জিকা (Yearly Calendar) তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে এবং সেই পঞ্জিকা ধরে কাজ করা হবে। ইতিমধ্যে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক পঞ্জিকা (Annual Cultural Calendar) তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রচলিত খেলাধূলার অন্তর্ভূক্তিকরণ ও সামগ্রিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বাৎসরিক ক্রীড়া পঞ্জিকা (Annual Sports Calendar) তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

মেয়র ত্রাণ তহবিল (Mayor Relief Fund) ঃ

- বিগত ১ বছরে মেয়র ত্রাণ তহবিল থেকে ১২৯ জনকে ৯,৮৯,০৪০ টাকা সাহায্য করা হয়েছে যার মাধ্যমে তাদের কেউ শিক্ষা খাতে, কেউ চিকিৎসা খাতে, কেউ অর্থনৈতিক সহায়তা খাতে, কেউ আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়িঘর মেরামতি খাতে, কেউবা খেলাধূলার প্রয়োজনে অথবা কোন অনাথ শিশু এই তহবিল থেকে সহায়তা পেয়েছেন। এরমধ্যে ১৩ জনকে প্রতি মাসে সহায়তা করা হচ্ছে এবং বাকিরা এককালীন সহায়তা পেয়েছেন।

- গত জানুয়ারিতে ১নং ওয়ার্ডের ধরমনগরে একটি অগ্নিসংযোগের দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ৯টি পরিবারকে ২০ হাজার টাকা করে, ৮টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা করে এবং ২টি পরিবারের অগ্নিদগ্ধ ২ জনকে চিকিৎসার জন্য এককালীন ৫ হাজার টাকা করে সহায়তা করা হয়েছে। এতে

মোট ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে যার মধ্যে মেয়র ত্রান তহবিল থেকে প্রত্যেক পরিবার ৫ হাজার টাকা করে পেয়েছে অর্থ্যাৎ এতে মেয়র ত্রাণ তহবিল থেকে মোট ৯৫ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে।

- ১৮নং ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনীতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে মোট ৪৮টি পরিবার সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই বিপত্তির দিনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে মেয়র ত্রাণ তহবিল থেকে এককালীন ৫ হাজার টাকা করে মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

- ৪০নং ওয়ার্ডের গৌরাঙ্গপল্লীতে কোর্টের নির্দেশে উচ্ছেদ হওয়া ১৪টি পরিবারকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার জন্য মেয়র ত্রাণ তহবিল থেকে এককালীন ৫ হাজার টাকা করে মোট ৭০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

কাউন্সিলার-তহবিল (C-LAD) ঃ

- এ বছর কাউন্সিলার LAD-এ অতিরিক্ত অর্থের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক কাউন্সিলার বছরে ৭.১৫ লক্ষ টাকা এই তহবিল থেকে বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করতে পারবেন।

কাউন্সিলারদের সাম্মানিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান ঃ

- মেয়র, ডেপুটি মেয়র, চেয়ারম্যান, বোরো চেয়ারম্যান, বিরোধী দলনেতা সহ সকল কাউন্সিলারগণকে সাম্মানিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মাননীয় মেয়র পুরনিগম থেকে কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণ করেন না।

কর্মীবর্গ বিভাগ (Establishment Department)

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রতিষ্ঠান বিভাগ মূলত একটি পুরকর্মী কল্যাণ বিভাগ। এই বিভাগে পুরকর্মচারীদের মাসিক বেতন, পদোন্নতি, নতুন কর্মী নিয়োগ, অসরপ্রাপ্ত অথবা প্রয়াত কর্মীদের পেনশন, গ্রাচ্যুইটি, জেনারেল প্রফিডেন্ট ফান্ড, মেডিক্লেম পলিসি ইত্যাদি বিষয়গুলি দেখাশোনা ও কার্যকরী করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের (কাউন্সিলরস) মাসিক সাম্মানিক প্রদানের দায়িত্বও এই দপ্তর পালন করে থাকে।

- শিলিগুড়ি পুরনিগম এই আর্থিক বছরে প্রত্যেক স্থায়ী কর্মচারী এবং তাদের নির্ভরশীল পরিবারের জন্য

সম্পূর্ণ নিজস্ব তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবীমার সুবিধা দেওয়া হয়েছে পরিবারের সদস্য সহ মোট ২৯৮ জন কর্মচারী এই পদক্ষেপে উপকৃত হয়েছেন। এর আগে প্রিমিয়ামের ৫০ শতাংশ কর্মচারীকে বহন করতে হতো। সেই সময় পরিবারের সদস্য সহ মোট ১৪৮ জন কর্মচারী এই বীমা প্রকল্পটি গ্রহন করেছিলেন।

- ৪৪ জন কাউন্সিলার ও তাদের পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীন ৭৬ জন চুক্তি ভিত্তিক গাড়ির চালকদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- শিলিগুড়ি পুরনিগম এই সময়কালে অতিরিক্ত আরো ২ জন প্রাক্তন কাউন্সিলারকে স্বাস্থ্য ভাতা প্রদান করছে।
- শিলিগুড়িবাসীর স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য ৪০ জন চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।
- নিয়মিতভাবে হাইড্রেন পরিস্কার করার জন্য ১৬১ জন শ্রমিক অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- শহরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অধীনে ইতিমধ্যে ৪৬ জন চুক্তিভিত্তিক গাড়ির চালক নিয়োগ করা হয়েছে। আরো ড্রাইভার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।
- জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের ন্যায় পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তরকে উন্নত করার জন্য নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে এবং এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- ২৭০ জন কর্মী যারা বিপদজনক কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের জন্য বাৎসারিক ২ লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা বীমা চালু করা হয়েছে।
- সমস্ত প্রকার কর্মচারীর উপস্থিতি online-এ সরাসরি নথিভূক্ত করার জন্য পুরনিগমের মূল অফিস সহ সমস্ত বোরো অফিসে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি শুরু করা হয়েছে এবং এই ব্যবস্থাপনাটি সি.সি. টিভির আওতায় আছে। বায়োমেট্রিক পদ্ধতির সঙ্গে বেতন প্রদান পদ্ধতির মেলবন্ধন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ■

পুরনো শিলিগুড়ি, স্মৃতি আর বৃষ্টির কথামালা

■ সুদীপ্তা সরকার

গত বছর জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের এক সন্ধেতে যে ধারাবর্ষণ শিলিগুড়িবাসীকে শঙ্কিত করে তুলেছিল, সেই শঙ্কা আর অস্থিরতার মধ্যেও এক টুকরো শৈশব সেদিন উঁকি দিয়ে গিয়েছিল আমার মতো আরও অনেকের মনে। গত বছরের কদিনের ধারাবাহিক বৃষ্টি নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা হয়েছিল স্যোশাল মিডিয়ায়। কারো কারো মতে গত ষাট সত্তর বছরে নাকি এরকম বৃষ্টিপাত হয়নি। আমার এই জন্মস্থান অন্যান্য জায়গার মতোই বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন আর তাই আজকাল এই শহর নিয়ে কোনো প্রসঙ্গ এলেই পুরোনো শিলিগুড়ির শৈশবের সুখস্মৃতি স্পর্শ করে যায় মনকে। সেই সময় তো মিডিয়ার এতো রমরমা ছিল না তাই সেদিনের ধারাবর্ষণের ধারাবিবরণী শোনার সুযোগও ছিল না। সেদিনের দেশবন্ধুপাড়া, বাবুপাড়া ছিল আমার শৈশবের বিচরণভূমি। ঘোর বর্ষায় শিলিগুড়ির নিচু অঞ্চল এই রকমই জলের তলায় থাকত ক'দিন ধরে। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির পর খানিক বিরতি, তারপর আস্তে আস্তে জল নেমে যেত। আমাদের বাড়িটা বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে ও বেশ নিচুতে হওয়ায় বাড়ির উঠোন জুড়ে জল জমতো আর কোনো কোনো দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণ বাড়ির বড়দের কপালে চিন্তার ভাঁজ এঁকে দিত। এই চিন্তার প্রভাব ছাপিয়েও আমার শিশুমন পরদিন সকালে পুরোনো অঙ্ক খাতার পাতা ছিঁড়ে নৌকো ভাসানোর আনন্দে মেতে উঠত। মনে আছে উঠোনে জমে থাকা জল কোনোরকমে পার হয়ে আমাদের ঠিকে কাজের লোক কাজ করতে আসত, তার মুখে শুনতাম বাড়িঘর ভেসে যাবার কাহিনী, তারা তখন স্কুলবাড়ির আশ্রয়ে। বাবুপাড়ার যে অংশটিকে এখন লেকটাউন বলা হয়, সেখানে ছিল ধানক্ষেত। স্পষ্ট মনে আছে ধানগাছগুলো গলা জলে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে আমাদের সম্মোহন করত। জল কিছুটা কমে এলে দাঁড়কিনে, কই, টাকি ও রঙিন খলসে মাছের ঝাঁক সারিবদ্ধভাবে ভেসে যেত। স্কুল বাদ দিয়ে বুকজলে নেমে গামছা দিয়ে সেইসব রঙিন মাছ সংগ্রহ করে কাচের বোতলে ভরে রাখা, এসব তো বর্ষার পরিচিত শৈশব-খেলা। প্রচন্ড বর্ষণে স্কুল ছুটি হয়ে গেলে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তা ও নালার জল একাকার হয়ে যাওয়ায় ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল জলখেলা খেলতে খেলতেই শৈশব পার করে কৈশোরে পা রাখা, আর ঠিক তখনই বিভূতিভূষণ, আম-আঁটির ভেঁপু, অপু, দুর্গা। শৈশবের "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে-ধান দেব মেপে", কৈশোরে দুর্গার "নেবুর পাতায় করমচা, হে বিষ্টি ধরে যা"— এভাবেই আমার শৈশব কৈশোরে উত্তরবঙ্গের বৃষ্টির কথামালা।

সময় এগিয়েছে অনেকটাই। এখন আর বাবুপাড়ায় ধানক্ষেত নেই, সেখানে সারিবদ্ধ কংক্রিটের বড় বড় বাড়ি,অতীতের সব চিহ্ন মুছে অহঙ্কারী,উদ্ধত। কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে শুনতে আমিও আজ পরিণত। পরিবর্তনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আজ যখন খোলনলচে পাল্টে যাওয়া আমার আজন্ম পরিচিত শহরটাকে দেখি, বিস্মিত হই। শহরের ডানা মেলা উড়ালপুলগুলো জাতীয় সড়কে মিশে গেছে আর তার উপর দিয়ে চলতে চলতে আজ আর কোনো দূরত্বই দূরত্ব মনে হয় না। আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরটার সঙ্গে আজ আর বড় শহরগুলোর কোনো তফাৎ করা দুষ্কর।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে আজকের শৈশবও। আজ আর উঠোনের জমা জলে নৌকো ভাসানোর মতো উঠোন নেই, হাঁটু জলে নেমে মাছ ধরার আনন্দ নেই। 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে' ছড়া কেটে ছুটে বেড়ানো নেই। আছে ক্লাস-টেস্ট, ইউনিট-টেস্ট,কম্পিউটার,ল্যাপটপ রুটিন, ডিসিপ্লিন ইত্যাদি। আজকের মা-বাবারাও সিস্টেমের খাঁচায় বন্দী। এই যন্ত্রসভ্যতার যুগে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশবের নির্মল আনন্দগুলো তবু আমরা, বড়রা একটু কি একটু সক্রিয় হতে পারি না...! আসুন,আজকের শৈশবকে আমাদের শেকড় চিনতে সাহায্য করি, জন্মদিনে উপহার দিই 'আম আঁটির ভেঁপু','আবোল তাবোল' কিংবা 'টুনটুনির বই'। ঘোর বর্ষায় জলে ভাসানোর জন্য হাতে তুলে দিই ছোট্ট ছোট্ট কাগজের নৌকো,যে নৌকো ওদের কল্পনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোনো এক ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশে, যারা ওদের গল্প শোনাবে এক ভারহীন মুক্ত পৃথিবীর। বাংলা নতুন বছর শুরু হয়েছে, কিছুকাল আগে ইংরেজি নতুন বছরের শুরুও হয়েছে। ঘোর বৃষ্টিদিন আসছে সামনে। এই শহর নিয়ে নতুন নতুন ভাবনা, পরিকল্পনা হচ্ছে। তার মাঝেই একটু ফিরে তাকানোর জন্যই হয়তো-বা এ লেখা।■

FIRST MEMBERS OF UNION BOARD SILIGURI MUNICIPALITY (24-05-1949 to 05-05-1952)

Year, Date & Period	Members	Chairman	Vice-Chairman
24.05.1949 to 05.05.1952	Sachindra Mohan Guha, SDO	Sachindra Mohan Guha, SDO, Chairman	Birendra Nath Roy Sarkar
	Bimal Kr. Mukherjee		
	Haripada Majumder		
	Jeorge Mahbert		
	Dr. Gopal Ch. Ghosh		
	Bindeswari Misir		
	Birendra Nath Roy Sarkar		
	Sarder Karna Bahadur Gurung		
	Rampada Chatterjee		
	Dr. Kshirodenath Chatterjee		
	Digendra Nath Roy Sarkar		
	Manturam Agarwala		
	Pradyut Kr. Bose		
	Abaninath Bhattacharjee		

NAMES OF THE FIRST CHAIRMAN / VICE-CHAIRMAN / ADMINISTRATOR OF UNION BOARD / SILIGURI MUNICIPALITY / SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (05-05-1952 to 23-12-1993)

Year, Date & Period	Members	Chairman / Vice-Chairman / Commissioner
05-05-1952 to 21-10-1952	Anil Kumar Dutta	Chairman
	Birendra Nath Roy Sarkar	Vice-Chairman
21-10-1952 to 10-02-1953	Ram Prasad Ganguly, SDO,	Chairman
	Birendra Nath Roy Sarkar	Vice-Chairman
30-08-1953 to 03-01-1957	Kshirode Prasad Barua, SDO,	Chairman
	Birendra Nath Roy Sarkar	Vice Chairman
	Jagadish Ch. Bhattacharjee	Vice-Chairman
03-01-1957 to 08-01-1957	S. K. Ganguly	Chairman
	Jagadish Ch. Bhattacharjee	Vice-Chairman
09.01.1958 to 11.02.1962	Jagadish Ch. Bhattacharjee	Chairman
	Panchanan Talukdar	Vice-Chairman
12-02-1962 to 06-05-1969	Jiban Kumar Dutta	Chairman
	Panchanan Talukdar	Vice-Chairman

NAMES OF THE FIRST CHAIRMAN / VICE-CHAIRMAN / ADMINISTRATOR OF UNION BOARD / SILIGURI MUNICIPALITY / SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (05-05-1952 to 23-12-1993)

07-05-1969 to 11-08-1969	D.C. Gupta	Administrator
12-08-1969 to 17-12-1970	S. Sengupta	Administrator
14-01-1971 to 18-02-1971	P. K. Dey	Administrator
19-02-1971 to 20-05-1972	P. N. Bhaduri	Administrator
10-04-1973 to 03-08-1974	N. Chaklanabis	Administrator
04-08-1974 to 03-12-1974	P. L. Dutta	Administrator
04-12-1974 to 30-07-1979	Krishnendu Narayan Choudhury	Chairman
	Gour Pada Dutta	Vice-Chairman
24-11-1979 to 06-07-1981	Chief Executive Officer	Administrator
07-07-1981 to 14-03-1988	Swapan Kumar Sarkar	Chainman
	Rabin Paul	Vice-Chairman
19-07-1988 to 04-07-1991	Ashok Bhattacharya	Chairman
	Hari Sadhan Ghosh	Vice-Chairman
03-08-1991 to 23-12-1993	Prof. Bikash Ghosh	Chairman
	Hari Sadhan Ghosh	Vice-Chairman

NAMES OF MAYOR / Dy. MAYOR/ ADMINISTRATOR OF SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (30.04.1994 to 22-02-2022 and till date)

30-04-1994 to 25-11-2008	Prof. Bikash Ghosh	Mayor
30-05-1994 to 29-11-1997	Ujjal Chowdhury	Deputy Mayor
03-09-1998 to 24-08-1999	Harisadhan Ghosh	Deputy Mayor
16-10-2004 to 25-11-2008	Munsi Nurul Islam	Deputy Mayor
19-12-2008 to 16-09-2009	Munsi Nurul Islam	Mayor
	Dilip Roy (01-01-2009-17-9-2009)	Deputy Mayor
01-10-2009	Gangotri Dutta	Mayor
	Nantu Paul (29-10-2009 to 27-6-2011)	Deputy Mayor
25-08-2011	Gangtotri Dutta	Mayor
	Ranjan Sil Sharma (11-7-11 to 13-3-2013)	Deputy Mayor
23-04-2013	Gangtori Dutta	Mayor
	Sabita Devi Agarwal (03-4-13 to 20-5-2014)	Deputy Mayor
19-08-2014 to 13-02-2015	R. Bimala, IAS	Chairman, Administrators
17-05-2015 to 17-03-2020	Asok Bhattacharya	Mayor
	Ram Bhajan Mahato	Deputy Mayor
18-05-2020 to 17-03-2021	Asok Bhattacharya	Chairman, Board of Administrators
18-03-2021 to 20-03-2021	Sonam Wangdi Bhutia	Administrator
20-03-2021 to 07-05-2021	Surendra Gupta, IAS	Administrator
07-05-2021 to 7-12-2021	Goutam Deb	Chairman, Board of Administrators
22-02-2022 to till date	Goutam Deb	Mayor
	Ranjan Sarkar	Deputy Mayor

FIRST ELECTED MEMBERS OF SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (29-05-1994 to 27-05-1999)

Year, Date & Period	Members	Mayor / Deputy Mayor / Member-Mayor in Council / Alderman / Chairman / Councilor
	Prof. Bikash Ghosh	Mayor
	Sri Ujjwal Chowdhury	Deputy Mayor
	Sri Partha Sarathi Das	Chairman
	Sri Mukul Sengupta	MMIC
	Sri Santi Chakraborty	MMIC
	Sri Kiran Kumar Anand	MMIC
	Sri Sri Paritosh Das	MMIC
	Sri Dilip Roy	MMIC
	Smt. Golap Roy	MMIC
	Sri Munsi Nurul Islam	Alderman
	Smt. Debika Chhetri	Alderman
	Sri Mangturam Choudhury	Alderman
	Sri Jogeswar Yadav	Councillor
	Sri Manindra Chakraborty	Councillor
	Smt. Jyostna Agarwal	Councillor
	Sri Ashok Goenka	Councillor
	Sri Ram Kumar Agarwala (1)	Councillor
	Sri Nantu Paul	Councillor
	Sri Ram Kumar Agarwala (2)	Councillor
	Sri Hari Sadhan Ghosh	Councillor
	Smt. Gouri Dutta	Councillor
	Sri Goutam Deb	Councillor
	Sri Bhupendra Nath Aditya	Councillor
	Smt. Beena De	Councillor
	Sri Manas Ghosh	Councillor
	Sri Krishna Chandra Paul	Councillor
	Sri Pratul Chakraborty	Councillor
	Sri Sushil Kumar Roy	Councillor
	Sri Makhan Chandra Ghosh	Councillor
	Sri Sanjib Sarkar	Councillor
	Sri Saradindu Chakraborty	Councillor
	Sri Sankar Kar	Councillor
	Sri Pulak Sengupta	Councillor

FIRST ELECTED MEMBERS OF SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (29-05-1994 to 27-05-1999)

Year, Date & Period	Members	Mayor / Deputy Mayor / Member-Mayor in Council / Alderman / Chairman / Councilor
	Sri Santi Ranjan Guha	Councillor
	Sri Dulal Kanti Das	Councillor
	Sri Samir Dey	Councillor
	Sri Nikhil Das	Councillor
	Sri Mantu Dey	Councillor
	Prof. Kalidas Chakraborty	Councillor
	Smt. Reba Sarkar	Councillor
	Sri Binay Kumar Bose	Councillor
	Sri Atul Chandra Das	Councillor
	Sri Kshudiram Roy	Councillor
	Sri Dilip Singh	Councillor
	Sri Balaram Nath	Councillor
	Sri Kartik Murmu	Councillor
	Smt. Snigdha Hazra	Councillor

ELECTED MEMBERS OF SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (18-5-2015 to 17-5-2020)

Year, Date & Period	Members	Mayor / Deputy Mayor / Member-Mayor in Council / Chairman / Councillor
	Sri Ashok Narayan Bhattacharya	Mayor
	Sri Rambhajan Mahato	Dy. Mayor
	Sri Dilip Singh	Chairman
	Sri Munshi Nurul Islam	MMIC
	Sri Mukul Sengupta	MMIC
	Sri Saradindu Chakraborty (Joy)	MMIC
	Sri Shankar Ghosh	MMIC
	Sri Kamal Agarwal	MMIC
	Sri Parimal Mitra	MMIC
	Smt. Snigdha Hazra (Haldar)	Borough Chairperson
	Sri Pradip Kumar Goyel	Borough Chairman

ELECTED MEMBERS OF SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION (18-5-2015 to 17-5-2020)

Year, Date & Period	Members	Mayor / Deputy Mayor / Member-Mayor in Council / Chairman / Councillor
	Smt. Malati Roy	Councillor
	Smt. Durga Singh	Councillor
	Sri Pintu Ghosh	Councillor
	Smt. Khusbu Mittal	Councillor
	Smt. Manjushree Paul (Dola)	Councillor
	Sri Nantu Paul (30-6-15 to 26-9-2016)	Leader of Opposition
	Sri Manik Dey	Councillor
	Smt. Shraboni Dutta	Councillor
	Sri Aurobinda Ghosh	Councillor
	Sri Sujoy Ghatak (Kala)	Councillor
	Smt. Shukla Dey	Councillor
	Sri Nikhil Sahani	Borough Chairman
	Smt. Mousumi Hazra	Councillor
	Sri Ranjan Sarkar (Rana) (27-9-16 to 30-3-2020)	Leader of the Opposition
	Smt. Swapna Dutta (Das)	Councillor
	Smt. Rinki Das	Councillor
	Sri Krishna Chandra Paul	Councillor
	Smt. Seema Saha	Councillor
	Sri Dipayan Roy	Councillor
	Sri Prasanta Chakraborty	Councillor’
	Smt. Sharmila Das	Councillor
	Sri Swapan Das	Councillor
	Smt. Dipa Biswas	Councillor
	Sri Tapas Chatterjee	Councillor
	Sri Asim Saha	Borough Chairman
	Smt. Golap Roy	Councillor
	Smt. Chandrani Mandol (Bulti)	Councillor
	Sri Alok Bhakta	Councillor
	Sri Ranjan Sil Sharma	Borough Chairman
	Sri Dulal Dutta	Councillor
	Smt. Reba Sarkar	Councillor
	Sri Sattyajit Adhikary (Bhaijaan)	Councillor
	Sri Rabi Roy	Councillor
	Smt. Ragini Singh	Councillor
	Smt. Pritikana Biswas	Councillor
	Smt. Rita Oron	Councillor